শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্যধারা
ও
অন্যান্য প্রবন্ধ

চিত্রা দেব

স্বপ্নদীপ
৭/ই শীতলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৫

প্রথম সংস্করণ বৈশাখ, ১৩৪৯
প্রচ্ছদ অমিয় ভট্টাচার্য
স্বপ্নদীপের পক্ষে মিতা সাহা কর্তৃক ৭/ই শীতলা লেন কলকাতা-৭০০০০৫
থেকে প্রকাশিত এবং অজিতকুমার ঘোষ কর্তৃক বাসন্তী প্রেস
৩৭ বিডন স্ট্রিট কলকাতা-৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখিকার অন্যান্য বই

ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহল

পুঁথিপত্রের আঙিনায় সমাজের আলপনা

অন্তঃপুরের আত্মকথা

অনালোচিত রবীন্দ্র প্রসঙ্গ

বিবাহবাসরের কাব্যকথা

বিষ্ণুপুরী রামায়ণ (সম্পাদিত)

কবিচন্দ্রের মহাভারত (সম্পাদিত)

কেমন দেখতে ছিলেন বুদ্ধদেব

ভূমিকা

বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাব অপরিসীম। তাঁর অসংখ্য জীবনচরিত লেখা হয়েছে, তাঁর বাণীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে নানাভাবে। ঠাকুরের পুণ্য আবির্ভাবে ক্রমক্ষীয়মাণ সাধক-জীবনী-রচনার ধারাটিই শুধু পুনর্জীবিত হয়নি, সহজ-সরল-অনাড়ম্বর ভাষায় গভীর তত্ত্বাদি আলোচনাতেও শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যমণ্ডলীকে পথিকৃৎ বলা চলে। উক্ত সন্ন্যাসীবৃন্দ বাংলা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় প্রচলিত সাধু ও চলিত লেখ্যরীতি-দুটিকেই পুষ্ট করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা ভাষাকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও সর্বজনবোধ্য করে তোলার জন্যে কলকাতার ভাষা নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা ভেবেছিলেন, তৃতীয় প্রবন্ধে সে-কথাই বলতে চেয়েছি। চতুর্থ রচনাটিতে স্ত্রীস্বাধীনতা ও শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা হয়েছে।

প্রবন্ধগুলি রচনার সময় দুষ্প্রাপ্য তথ্য ও গ্রন্থাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল, শ্রীঅরুণ বসু, শ্রীঅশোক দাস, শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী মীরা ঘোষ ও শ্রীহর্ষ দত্ত। চারটি প্রবন্ধই সংক্ষেপে বিভিন্ন সময়ে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলি লেখার

সময়ে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছিলেন স্বামী অব্জজানন্দ মহারাজ।

অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি সুচারুরূপে প্রকাশ করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন শ্রীস্বপনকুমার সাহা ও শ্রীবিমলকুমার পাল।

সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

নববর্ষ, ১৩৪৯ — চিত্রা দেব

সূচীপত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্যধারা ও বাংলাসাহিত্য

বাংলাদেশে আধ্যাত্মিক জীবনসাধনার প্রেরণাস্বরূপ দুই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁরা শুধু ধর্মচেতনা ও ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র বাঙালীর জীবনে ও মননে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বাঙালীর চিত্তলোকে যে দুটি নবজাগরণের আলোকোদ্ভাস ঘটেছিল, হৃদয়-মন্থন করে যে অমৃতের উৎসারণ হয়েছিল তারই ঘনীভূত রসরূপ পরিগ্রহ করেছিলেন এই দুই দেবকল্প মহামানব, শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এই দুজনের যুগান্তকারী আবির্ভাব বাঙালী মানসকে বিকশিত করেছে। আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে এই দুই দেবমানবের প্রভাব কম নয়। ভারতবর্ষীয় ধ্যান-ধারণায় পূর্বে অবতাররূপে যে মহাপুরুষেরা এসেছিলেন তাঁরাই ছিলেন ভারতীয় মহাকাব্যের নায়ক। কিন্তু দশাননজয়ী অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র ও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধনিয়ন্তা দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই নরদেব মহাপুরুষদ্বয়ের পার্থক্য আছে, বরং পীত চীবরধারী মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষু সন্ন্যাসী বুদ্ধদেবের সঙ্গেই এঁদের সাদৃশ্য বেশি। ত্যাগ-তিতিক্ষার মূর্ত প্রতীক বুদ্ধদেবের আবির্ভাব যেমন আলোড়ন জাগিয়েছিল উত্তর ভারতে; জাতক ও পালিসাহিত্যে পড়েছিল তাঁর প্রভাব, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবও সেই আলোড়ন জাগিয়েছিল বাঙালীর জীবনে। 'গীতা'য় উক্ত 'সম্ভবামি যুগে যুগে' বাণীও সার্থক হয়েছে তাঁদের আবির্ভাবে। তাই, বাঙালীর জীবনসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবের কথা বলতে গেলে বারংবার শ্রীচৈতন্যদেবের কথাও এসে পড়ে।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে একদিকে যেমন বাঙালীর অন্তরঙ্গ জীবনে ঘটেছিল ভাবের উন্মেষ, অপরদিকে বৃহৎ মানবতার আদর্শ ও বিস্তার ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই তাঁর আবির্ভাবকে নবজাগরণ

বলতে আমাদের দ্বিধা নেই। ভাবের আদান-প্রদানেই নবজাগরণের সূচনা হয়। সে সময়ে বহিঃশক্তিরূপে বাংলাদেশে এসেছিল মধ্য-প্রাচ্যের মুসলমানী প্রভাব, আর বাঙালী জীবনের অকুণ্ঠ প্রেমধর্ম শ্রীচৈতন্যদেব দুহাতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সমগ্র ভারতভূমিতে। উনিশ শতকের নবজাগরণ আমাদের বিশেষ পরিচিত। ইউরোপীয় প্রভাবের সঙ্গে প্রাচ্য সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটল এই শতাব্দীতে। এই সময়েই আমরা পেলাম শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে। প্রাচ্য বাণী ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা বহির্বিশ্বে নিয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাপার্ষদমণ্ডলী।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য গতানুগতিক তুচ্ছতা থেকে মুক্তিলাভ করে উদারতার পরিমণ্ডলে সম্প্রসারিত হয়েছিল। তাঁর অলোকসামান্য প্রভাব দীপবর্তিকার মতোই ধর্মান্ধ সীমাবদ্ধতার কুসংস্কারকে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে দূর করতে সক্ষম হল। তাঁর মানবলীলার অপূর্ব বৃত্তান্ত চৈতন্য-জীবনীগুলিকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। জীবিত বা অল্পকাল পূর্বে লোকান্তরিত কোনো মহাপুরুষকে অবলম্বন করে এত জীবনী-সাহিত্য রচনা ও তার দার্শনিক ব্যাখ্যা আগে হয়নি। এর প্রতিফলন দেখা যাবে উনিশ ও বিশ শতকের সাহিত্যেও।

কামারপুকুর গ্রামের নিষ্ঠাবান ভক্ত ও ব্রাহ্মণ বংশের পুত্র গদাধর যেদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ভবতারিণীমূর্তির মধ্যে জগজ্জননীর চিন্ময়ী রূপ দর্শন করে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবে রূপান্তরিত হলেন সেদিন তাঁর পুণ্য পাদস্পর্শ বক্ষে ধারণ করে কলকাতা শহর নবদ্বীপের মতোই পবিত্র তীর্থে পরিণত হল। তাঁর অলোকসামান্য জীবনসাধনা ও অলৌকিক লীলামাহাত্ম্য চিরন্তন সাহিত্যরস-পিপাসু বাঙালীর ভক্তিনত চিত্তে পুনরায় মহামানবের জীবনলীলা প্রকাশের বাসনা নিয়ে দেখা দিল। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রেও দেখা দিল বিস্ময়কর পরিবর্তন। 'ভাগবতী তনু' চৈতন্যদেবের জীবন তাঁর ভক্তদের কাছে 'ভাবের মূরতি'। তিনি ছিলেন 'মধুরবৃন্দাবিপিনমাধুরীপ্রবেশচাতুরীসার' কিছু বাস্তব ও কিছু কল্পনায় মেশা। তাঁর জীবনচরিতগুলিও তাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনচরিত রচনার সময় এই বিপর্যয় ঘটেনি। কারণ জীবনী রচনার একাধিক আদর্শ তাঁর ভক্তমণ্ডলীর সামনে ছিল। সর্বোপরি তাঁরাও ছিলেন উচ্চশিক্ষিত আধুনিক মনন-সম্পন্ন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁরা নিয়মরাহিত্যের ব্রতধারী। প্রচণ্ড সম্ভাবনা ও প্রবল ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কেউ সুকুমার রস-সাহিত্যের ললিত-লোভন শাখার প্রতি বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত করেননি। শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং তাঁর শিক্ষা ও সাধনাকে পূর্ণমাত্রায় সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করার জন্যই তাঁরা লেখনী ধারণ করে-ছিলেন। সেই সঙ্গে ঔপনিষদিক চেতনাযুক্ত সনাতন হিন্দুধর্মের সংস্কারমুক্ত পুনরুজ্জীবনও তাঁদের লক্ষ্য ছিল।

পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মপ্রবর্তক কোনো লিখিত শাস্ত্র রেখে যাননি। তাঁদের শিষ্য ও অনুসরণকারীরাই তাঁদের কথা জানিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনসাধনাও সর্বসমক্ষে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ধর্মান্দোলন' নামে পরিচিত। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ নতুন কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেননি, বরং ব্রাহ্মধর্ম-প্লাবিত তৎকালীন বাংলাদেশে পুনরায় সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন বলা চলে। তবে তাঁর ধর্মচেতনায় কোনো গোঁড়ামি, প্রচারধর্মিতা বা সাম্প্রদায়িক 'স্কুল' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছিল না। তিনি সর্ব মত ও পথের সমন্বয়বাদী। সর্বধর্মের নিয়মনিষ্ঠ আচারগুলি পালন করে তিনি দেখিয়েছিলেন 'যত মত তত পথ'. আসলে সব ধর্মই সমান। সবারই লক্ষ্য এক, পথ শুধু ভিন্ন। যে পথেই যাওয়া যাক না কেন, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিক ভক্তি অটুট থাকলে ঈশ্বরোপলব্ধি হবেই। সুতরাং বিরোধের প্রয়োজন কি? তাঁর এই উদার মতবাদ আকৃষ্ট করেছিল আপামর জনসাধারণকে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মনেও ছিল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ পাবার জন্যে দক্ষিণেশ্বরে সমবেত হতেন। ঠাকুর স্বয়ং কিছু রচনা করেননি, কিন্তু তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত অমৃতোপম বাণী ও উপদেশই সমস্ত সাহিত্যের সার। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভ্রাতারা শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক জীবনসাধনার কথা সমগ্র বিশ্বের

সম্মুখে উপস্থিত করেন। তাঁদের সমবেত চেষ্টার ফলেই প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক বাণী প্রতীচ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্ত্যলীলাবসানের পর তাঁর জীবন-বাণীকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতকে যিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথাই সর্বাগ্রে স্মরণ করছি। অবশ্য শ্রীম-র কথামৃত সঙ্কলনের বহু পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবৎকালেই তাঁর উপদেশ-বচনামৃত সঙ্কলনের কথা কারো কারো মনে জাগ্রত হয়। এ কাজে সর্বপ্রথম আগ্রহ প্রকাশ করেন সম্ভবত ব্রম্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় ১৮৭৫-এর ১৫ মার্চ থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় এই বাণী সঙ্কলন করেন গিরিশচন্দ্র সেন। এই সঙ্কলনটি ১৮৭৮-এ 'শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় ছিল ১৮৪টি প্রশ্ন ও তার উত্তর। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসংবরণের অব্যবহিত পরে এই পুস্তিকায় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীও সংযোজিত হয়েছিল। এছাড়া আরও একটি উপদেশ-সঙ্কলন প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে। সঙ্কলক সুরেশচন্দ্র দত্ত 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' নামে গ্রন্থটি প্রথমে প্রকাশ করেন। পরে এই গ্রন্থটিই সম্ভবত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ' নামে পরিচিত হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে উপস্থিত হন ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে। এই সময় থেকে ঠাকুরের দেহত্যাগের সময় পর্যন্ত শ্রীম অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে তাঁকে দর্শন করেন ও প্রতিদিনকার দিনলিপিতে এই সাক্ষাতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (১৯০২ খ্রীস্টাব্দে) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' প্রকাশের সময় থেকেই গ্রন্থটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীম পাঁচখণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শেষ জীবনের অনুপুঙ্খ ঘটনা তথা অজস্র মূল্যবান উপদেশ সঙ্কলন করেছেন। তাঁর অসামান্য স্মৃতিশক্তি ও সহজ-সরল বর্ণনা-শক্তির গুণে আমরা 'কথামৃত' পাঠকালে দৃশ্যমান ছায়াচিত্রের মতো ঠাকুরের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলী মানস নয়নে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হই।

উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় 'শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি'তে আছে ঃ

'প্রশ্ন—নির্ভরের ও প্রার্থনার কিরূপ ভাব ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বানরের ছানা মার বুক জড়িয়া ধরিয়া থাকে। বিড়ালের ছানা ম্যাও ম্যাও করিয়া থাকে। প্রথমটি নির্ভরের ভাব, দ্বিতীয়টি প্রার্থনার ভাব।' প্রায় একই প্রসঙ্গ 'কথামৃতে' পাওয়া যাবে ভিন্ন রূপে ঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণ—দু রকম ভক্ত আছে। এক থাকের বিল্লীর ছা-র স্বভাব। সব নির্ভর--মা মা করে। বিল্লীর ছা কেবল মিউ মিউ করে। কোথায় যাবে, কি করবে—কিছুই জানে না। মা কখন হেঁশালে রাখ্ছে—কখনবা বিছানার উপরে রাখছে। এরূপ ভক্ত ঈশ্বরকে আমমোক্তারি (বকলমা) দেয়।...

'আর এক থাক ভক্ত আছে, তাদের বানরের ছা-র স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো সো গুণে মাকে আঁকড়ে ধরে। এদের একটু কর্তৃত্ববোধ আছে। আমায় তীর্থ করতে হবে, জপ তপ করতে হবে, ষোড়-শোপচারে পূজা করতে হবে, তবে আমি ঈশ্বরকে ধরতে পারবো—এদের এই ভাব।'

বলা বাহুল্য 'কথামৃতে'র বর্ণনা পড়তে বেশি ভাল লাগে। প্রথম গ্রন্থে প্রশ্নোত্তর আছে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের স্পর্শ আছে দ্বিতীয় গ্রন্থে। শ্রীম 'কথামৃত' গ্রন্থে শুধু ঠাকুরের কথা নয়, পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলিকেও যথাযথভাবে উপস্থিত করেছেন। তাঁর হাস্য, বিরক্তি, আনমনা ভাবগুলিও বাদ পড়েনি। রামকৃষ্ণদেব তাঁর সমগ্র জীবনসাধনালব্ধ হিন্দুধর্মের বেদবেদান্ত আশ্রয়ী কঠোর ঈশ্বরোপাসনাকে অপূর্ব প্রেমার্তির দ্বারা সহজ সুন্দর করে বইয়ে দিয়েছিলেন বাঙালীর প্রাণগঙ্গায়, ভক্তিধর্মের মানস-জোয়ারে। শ্রীম সেই অমৃতধারাকে রেখে গিয়েছেন পরবর্তীকালের পিপাসিত ভক্তদের জন্যে। ভাষা ও বর্ণনার দিক থেকেও 'কথামৃত' বাংলাসাহিত্যের জগতে এনেছে নতুন জোয়ার। 'শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি'তেও অবশ্য ভাষার রূপান্তর লক্ষণীয়। এই পুস্তিকা যখন প্রকাশিত হয় তখন বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে 'আলালী ভাষা' ও

'হুতোমী ভাষা' এসে গেলেও গুরুগম্ভীর বিষয়ে কোনো কিছু প্রকাশ করবার প্রয়োজন হলে সকলেই সাধুভাষার সাহায্য নিতেন। হুতোমী ভাষা গভীর ভাব প্রকাশের পক্ষে অযোগ্য, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখের ভাষা সাধুভাষা না হলেও যথেষ্ট উপযোগী। গিরিশচন্দ্র যখন প্রশ্ন করেছিলেন,

'ঈশ্বর কিভাবে দেখা দেন?' তখন শ্রীরামকৃষ্ণ একটি সহজ ও পরিচিত উপমা দিয়ে বলেছিলেন, 'বড় মাছ গভীর জলে থাকে, সচরাচর সেই মাছের দেখা পাওয়া যায় না। ভাল চার দিতে দিতে হঠাৎ দুই একবার সেই মাছের ঘাই দেখা যায়, পরে বড়শি বিদ্ধ হয়। তদ্রূপ ভগবান ঘনসচ্চিদানন্দ গূঢ়ভাবে থাকেন, যোগ ধ্যান প্রেম ভক্তির চার দিতে দিতে কখন দৈবাৎ তিনি আসিয়া দেখা দেন। তৎপর ধরা দিয়া থাকেন।'

এ ভাষা গুরুগম্ভীর নয়, সরস। অথচ গভীর ভাবও সহজে ব্যক্ত করা চলে। 'কথামৃতে'র ভাষা আরও সহজ, আরও মৌখিক। যেমন,

"প্রথমে 'নেতি', 'নেতি' করতে হয়। তিনি পঞ্চভূত নন; ইন্দ্রিয় নন; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার নন; তিনি সকল তত্ত্বের অতীত। ছাদে উঠতে হবে, সব সিঁড়ি একে একে ত্যাগ করে যেতে হবে। সিঁড়ি কিছু ছাদ নয়। কিন্তু ছাদের উপর পৌঁছে দেখা যায় যে, যে জিনিসে ছাদ তৈয়ারী, ইট, চুন, সুরকি—সেই জিনিসে সিঁড়িও তৈয়ারী। যিনি পরব্রহ্ম তিনিই এই জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। যিনি আত্মা, তিনিই পঞ্চভূত হয়েছেন।"

কথ্য গদ্যরীতির এই উদাহরণই পরবর্তীকালের বাংলাসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশি। দৈনন্দিন জীবন থেকে প্রচলিত উপমার ব্যবহারও লক্ষ্য করার মতো।

'ঈশ্বরকে কি প্রকারে লাভ করা যায়?

রাঙা মুড়ো রুই মাছ ধরতে যেমন ছিপ ফেলে ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হয়, তদ্রূপ ধৈর্যের সাধন চাই।'

কিংবা,

'এক-একবার বসে বসে আমি খতাই। তা দেখি অন্য পদ্ম কারুর দশদল, কারুর ষোড়শদল, কারুর শতদল, কিন্তু পদ্ম মধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।'

কিংবা,

'কি জানো, রুচি ভেদ, আর যার যা পেটে সয়। তিনি নানা ধর্ম নানা মত করেছেন—অধিকারী বিশেষের জন্য। সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নয়, তাই আবার তিনি সাকার পূজার ব্যবস্থা করেছেন। মা ছেলেদের জন্য বাড়িতে মাছ এনেছে। সেই মাছে ঝোল, অম্বল, ভাজা, আবার পোলাও করলেন। সকলের পেটে কিন্তু পোলাও সয় না; তাই কারু কারু জন্য মাছের ঝোল করেছেন—তারা পেটরোগা। আবার কারু সাধ অম্বল খায়, বা মাছ ভাজা খায়। প্রকৃতি আলাদা—আবার অধিকারী ভেদ।'

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ' গ্রন্থেও বহু গল্প ও উপদেশ আছে। মানব মনস্তত্ত্ব ও ধর্ম-জিজ্ঞাসার এক সূক্ষ্ম যোগসূত্র রচনা করে রামকৃষ্ণদেব গল্পগুলি শোনাতেন। এ গ্রন্থের অনেক গল্পই 'কথামৃতে' নেই। যেমন ধরা যাক 'যকের ধনে'র গল্পটি:

এক নাপিত পথে চলতে হঠাৎ শুনতে পেল, কে যেন বলছে, 'সাত ঘড়া টাকা নিবি?' নাপিত আশ্চর্য হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখে, কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না। সাত ঘড়া টাকার নাম শুনে সে কিঞ্চিৎ লুব্ধ হয়ে ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে বললো, 'নেবো'। অমনি সে আবার শুনতে পেলে কে যেন বলল, 'আচ্ছা, তোর বাড়িতে দিয়ে এলুম, নিগে যা।' নাপিত বাড়ি গিয়ে দেখে যথার্থই তার বাড়িতে ঘড়া রয়েছে। নাপিত ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখতে পেলে ছ'টি ঘড়া মোহরে ভরা আর একটি ঘড়া খালি রয়েছে। খালি ঘড়াটি পূর্ণ করবার জন্যে তার একান্ত ইচ্ছা হল এবং তার ঘরে সোনা-রূপা যা কিছু ছিল সব এনে সেই খালি ঘড়ার ভিতর পুরলে, কিন্তু তাতে সে ঘড়া পুরবে কেন? নাপিত সংসারের খরচ কমিয়ে রোজ রোজ সেই ঘড়ায় পুরতে

লাগল। এবং অবশেষে কাকুতিমিনতি করে রাজামশাইকে জানালে যে তার সংসারে এখন ভারী কষ্ট হচ্ছে, সে যে ক' টাকা পায়, তাতে তার চলে না। রাজা তার মাইনে বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু নাপিতের যে দশা সেই দশা। সে এখন লোকের কাছে মেগে-পেতে খায় এবং যা কিছু টাকা পায় তা ঐ ঘড়ার ভিতর পোরে। পরে রাজা একদিন তার দুর্দশা দেখে বললেন, 'হ্যাঁরে, আগে তুই কম মাইনে পেতিস তাতে তো বেশ চলতো, আর এখন তুই দ্বিগুণ পাচ্ছিস, তবু তোর চলে না কেন রে? তুই কি সাত ঘড়া মোহর এনেছিস নাকি?' নাপিত থতমত খেয়ে বললে, 'আজ্ঞে, আপনাকে কে বললে?' রাজা বললেন, 'আরে সে যে যকের ধন, সেই যক্ষটা আমার কাছে এসে বলেছিল, সাত ঘড়া ধন নেবে? আমি বললাম, জমার টাকা না খরচের টাকা? যক্ষটা অমনিই পালিয়ে গেল, আর কোনো কথা কইলো না। ও টাকা কি নিতে আছে, ও টাকা খরচ করবার জো নেই, ও কেবলই জমার টাকা, ভাল চাস তো ফিরিয়ে দিয়ে আয়।' নাপিত ঐ কথা শুনে তাড়াতাড়ি আগের সেই জায়গায় গিয়ে বললে, 'তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমার কাজ নেই।' যক্ষ বলল, 'আচ্ছা'। বাড়িতে এসে নাপিত দেখে ঘড়াগুলো কে নিয়ে গেছে। লাভের মধ্যে সেই সঙ্গে সে এতকাল ধরে সেই খালি ঘড়াটার ভিতর যা পুরেছিল, সেগুলিও নিয়ে গেছে। গল্প শেষ করে ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, 'ধর্মরাজ্যেও ঐরূপ, জমা-খরচ বোধ না থাকলে শেষে সর্বস্ব হারাতে হয়।' ঠিক কি উপলক্ষে এবং কাকে ঠাকুর এই গল্প বলেছিলেন তা জানার উপায় নেই। তবু আমাদের অন্তরবাসী যক্ষের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যখন চরম সর্বনাশের মোহানায় নিয়ে আসে তখনই পরিপূর্ণ অনাসক্তির মূর্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ'কে বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলা চলে। ভাব ও ভাষার সারল্য ও অনায়াস লাবণ্য পাঠককে মুগ্ধ করে। তবে বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব শুধুমাত্র তাঁর উপদেশ ও বাণী সঙ্কলনের সঙ্গে শেষ হয়নি, তাঁর

অনুগামী শিষ্যদের অবিরল সাহিত্যচর্চার মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। এই সাহিত্যধারাকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাবিত সাহিত্য নামে অভিহিত করতে পারি।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের আলোকে যুক্তিসিদ্ধ দৃঢ়তা ও ঔপনিষদিক চেতনায় ভাস্বর সনাতন হিন্দুধর্মের ও রামকৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্মের সঙ্গে তার অভিন্নতা প্রতিপাদন করে বহু বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেই বক্তৃতাসঙ্কলনের অনুবাদের মূল্য অপরিসীম। অন্যান্য রচনায় তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার প্রতিফলন চোখে পড়ে।' ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, মনুষ্যত্ব, দর্শন, সর্বোপরি বেদান্ত-আশ্রয়ী অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ভক্তিধর্মের যুক্তিনিষ্ঠ একীকরণের ভিত্তিভূমি নির্মাণে তাঁর মতো শক্তিশালী লেখক সর্বদেশে বিরল। বেদান্তকে তিনি দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজন, চরিত্র বিকাশ প্রভৃতি বাস্তব ব্যাপারে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। শুধু বেদান্ত আলোচনা নয়, জ্ঞানযোগ কর্মযোগ প্রভৃতি গীতা উপদেশকে কীভাবে জীবনে কার্যকরী করা যায় তার বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর প্রমাণ তিনি রেখে গিয়েছেন উত্তরসূরি সাধকদের জন্য। সাধু ও চলিত বাংলা ভাষায় তাঁর যেমন অনায়াস-দক্ষতা ছিল তেমনি দখল ছিল ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায়। মঠের আরাত্রিক ভজন ও রামকৃষ্ণস্তোত্রগুলি ছাড়াও তাঁর উৎকৃষ্ট কবিতার সংখ্যা কম নয়। তাঁর চারটি বাংলা গ্রন্থে দেখা যাবে বাংলা গদ্যরীতির বিবর্তন। 'বর্তমান ভারতে'র গুরুগম্ভীর সংস্কৃতগন্ধী ভাষা ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র স্বচ্ছন্দ দেশজ শব্দে সমৃদ্ধ চলিত ভাষা যে এক ব্যক্তির লেখা তা মনেই হয় না। 'ভাববার কথা' ও 'পরিব্রাজকে'র ভাষাও সহজ-সরল চলিত গদ্যে লেখা। বাংলা ভাষা নিয়েও তিনি চিন্তা করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, 'আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন বিদ্বান এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে।' কিন্তু তিনি দেখেছিলেন "বুদ্ধ থেকে চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন।" স্বামীজীও গ্রহণ করলেন লোকশিক্ষার

ভাষা। 'ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে সেই, একচোটে পাথর কেটে নেয়, দাঁত পড়ে না।' আধুনিক বাংলা ভাষাও তো এই ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। উদ্বোধন কার্যালয়-প্রকাশিত দশখণ্ডে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' আমাদের জাতীয় সম্পদ—ভাবের সমুদ্র—জাতির গর্ব।

অসংখ্য সঙ্গীত, স্তোত্র, প্রার্থনামন্ত্র, বন্দনাগীতি রচনা করে রামকৃষ্ণ-দেবের আধ্যাত্মিক ধ্যানমূর্তির বাণীরূপ দান করেছিলেন তাঁর আর-এক শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ। একদিকে তিনি গবেষণা, ভাষণ ও রচনার মধ্য দিয়ে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যটিকে তুলে ধরেছেন, অপরদিকে 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থে সহজ সরস ভাষায় তিনি ঐকান্তিক গুরুভক্তি ও ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যদের কথা বিবৃত করেছেন। অভেদানন্দ আর-একটি জটিল জীবন-জিজ্ঞাসাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর 'মরণের পারে', 'আত্মজ্ঞান', 'পুনর্জন্মবাদ' প্রভৃতি গ্রন্থে। মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব আছে কিনা এ প্রশ্ন সকলেরই। সেই প্রশ্নকেই তিনি বিশ্লেষণ করেছেন নানাভাবে। তাঁর বিভিন্ন রচনার অনুবাদও হয়েছে। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ লীলাপার্ষদরূপে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই বাংলাসাহিত্য-ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাবিত একটি নতুন সাহিত্যধারার সন্ধান দিয়েছেন।

স্বামী সারদানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে পরমহংসদেবের সমগ্র জীবনকথা বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর রচনা যুক্তিনিষ্ঠ, বাস্তব, বৈজ্ঞানিক সত্যনির্ভর অথচ ঐকান্তিক ভক্তিনম্রতায় সমুজ্জ্বল। রামকৃষ্ণদেবের ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক জীবনসংক্রান্ত সমস্ত কিছু জ্ঞাতব্য বস্তুর আকর গ্রন্থরূপে আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গে'-র পাঁচটি খণ্ডকে গ্রহণ করতে পারি। মধ্যযুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করে যে দুরূহ কর্ম সম্পাদন করেছিলেন, এযুগে স্বামী সারদানন্দ সেই দুরূহ কার্য সম্পাদন করলেন 'লীলাপ্রসঙ্গ' রচনা করে। বরং তাঁর মনস্বিতার সঙ্গে লীলাপার্ষদের ভূমিকা যুক্ত হওয়ায় গ্রন্থটি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। রামকৃষ্ণদেবের জীবনী রচনার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবন না

করে অনেকে মনে করতেন তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তি যাঁর সাম্প্রদায়িক মত সৃষ্টি করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। এই ধারণা দূর করবার জন্যেই স্বামী সারদানন্দ রামকৃষ্ণদেবের জীবনচরিত রচনায় মনোযোগী হন। কারণ তাঁর মতে ঐ 'অলোকসামান্য জীবনের সহিত সনাতন হিন্দু বা বৈদিক ধর্মের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা স্পষ্ট নির্দেশ করিয়া কেহই উহার অনুশীলন করেন নাই।'

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠ পরিচালনার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য কার্যে ব্যাপৃত থাকায় তিনি বিশেষ কিছু লেখেননি। কিন্তু তাঁর লেখা পত্রগুলি ভক্তিসিক্ত আত্মনিবেদনের অপূর্ব নিদর্শন। সন্ন্যাসীর গৈরিক কাষায়-বসনের অন্তরালে তাঁর যে কুসুমকোমল অন্তর লুকিয়ে ছিল তার পরিচয় মেলে তাঁর শিষ্যদের প্রতি উদ্বেগাকুল উপদেশাবলীর মধ্যে। 'মহারাজ অমিত বজ্রতেজ-সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার বহুমুখী শক্তি বর্ষার বারিধারার ন্যায় শতমুখে প্রবাহিত হইত। কিন্তু এত তেজ এত শক্তি কিরূপে যে মৃন্ময় আধারে এত শান্ত হইয়া থাকিত, তাহার সন্ধান কেহ জানিত না।' দেবেন্দ্রনাথ বসুর এই উক্তির আলোকেই স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রকৃত স্বরূপ চেনা যায়। এই আপ্তকাম সাধকের পত্রগুলি শিষ্যমণ্ডলীর হতাশ চিত্তে উৎসাহ ও আশার উদ্দীপনা সঞ্চার করত। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীরও উল্লেখ করা চলে। তিনিও অজস্র পত্র লিখেছিলেন তাঁর গুরু-ভ্রাতা, শিষ্য ও অনুরাগীদের কাছে। সেইসব পত্রে চেষ্টাকৃত অলঙ্করণের পরিবর্তে ছিল আন্তরিকতা, রামকৃষ্ণ মিশন গড়ে তোলার আত্যন্তিক প্রয়াসের কথা। চলিত ভাষার অপূর্ব উদাহরণরূপে সে চিঠিগুলিকে এখন সকলেই গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলা চলে, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপার্ষদদের মধ্যে অন্তঃসারশূন্য প্রচারধর্মী সাম্প্রদায়িকতার নগ্ন প্রকাশ ছিল না কোনো সময়েই। সহজ সরল আন্তরিকতা, ঐকান্তিক ধর্মবিশ্বাসজনিত সত্যোপলব্ধি ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশগুলি আপনা-আপনিই সাহিত্যিক রূপ লাভ করত, চেষ্টাকৃতভাবে সাহিত্যিক সৌন্দর্যবৃদ্ধির প্রয়াস না থাকা সত্ত্বেও। স্বামী প্রেমানন্দের সম্পর্কেও একথা বলা চলে। তাঁর চিঠির ভাষা বড় সুন্দর কিন্তু

বিচিত্র। যেমন 'চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হইল, আসমানেতে বানায় ঘর। প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর। ও ভাই, থাকে না তার আত্মপর। ...ভালবাসায় যে অনন্ত জীবন—অমরত্ব লাভ হয়। একবার দ্বাপরে প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারানী শ্রীবৃন্দাবনে এই প্রেমের লীলা দেখিয়ে অমর হয়ে গেছেন। এই ভালবাসা, এই নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভালবাসা অমূল্য ধন, পরম নিধি। এসো এই ধন লুটে নিয়ে আণ্ডিল হয়ে যাই। এই জিনিস লড়াই করে কেড়ে নিবার জো নেই—অবশ্য পশুবলের কথা বলছি জানবে। বিশ্বাস-বল শ্রদ্ধা-বল চাই এ ধন লাভ করতে হলে।' পড়তে পড়তে মনে হয় এ যেন চিঠি নয়, নিজস্ব উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ।

স্বামী তুরীয়ানন্দ কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি, কিন্তু তিনি কাব্যরসের রসিক ছিলেন। তাঁর লেখা চিঠিগুলির সাহিত্যমূল্য কম নয় অথচ কোথাও চেষ্টাকৃত অলঙ্করণ নেই, 'প্রকৃত সহানুভূতি ও ভালবাসার দ্বারাই চরিত্র সংশোধন হয়, পাণ্ডিত্য বা বুদ্ধিমত্তায় বিশেষ কিছুই হয় না—এই কথা নিশ্চিত জানিও। অপরের প্রতি যদি তোমার সত্যই সমবেদনা থাকে এবং নিজের জীবন পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও স্বার্থগন্ধ শূন্য হয় তবে মা তোমার দ্বারা অসম্ভব সম্ভব করাইবেন। নতুবা মুখের কথা যত গম্ভীর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হউক না কেন, শুধু উহাতে কোনো ফল হইবে না। ইহাই রহস্য।'

স্বামী শিবানন্দ তাঁর সমগ্র জীবনের অসামান্য ত্যাগ-তিতিক্ষার সাধনায় বারাণসীতে অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উপদেশগুলি 'শিবানন্দবাণী' নামে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বাণীও উপমার তুলনায় অনবদ্য। যেমন, 'খাঁটি সন্ন্যাসী হওয়া খুবই কঠিন, তাছাড়া খালি বিরজাহোম করে গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হল না। যে কায়মনোবাক্যে সব এষণা ত্যাগ করতে পেরেছে সেই হল ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী। যত পারিস ত্যাগ করে যা। দেখবি সময়ে দরকার হলে মা এত দেবেন যে সামলাতে পারবিনি। ঠিক সাঁকোর জলের মতো একধার দিয়ে আসবে আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে; কিন্তু সঞ্চয় করেছিস তো আর

আসবে না তখন ময়লা জমতে শুরু করবে।...ঠাকুরের কথায় আছে যে, মৌমাছি ফুলেই বসে, মধুই পান করে। তেমনি তোমরাও শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্বাবস্থায় ভগবানকে নিয়েই বিলাস করবে।...ঠাকুর যেমন বলতেন কৃপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না। ঐ পাল তোলাই হল নিজের চেষ্টা।' সহজ সরল ভাষা দিয়ে প্রাণের গভীর বাণীকে ব্যক্ত করবার যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাংলাসাহিত্যে শুরু হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলী তাতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দিলেও তাঁদের ভূমিকা কম নয়। প্রাত্যহিক সমাজ-সংসার থেকে দূরে, প্রচলিত জীবনযাত্রা থেকে সরে গিয়েও তাঁরা স্বীয় জীবনসাধনা দ্বারা যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তার বাণীরূপ দান করার সময় কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার জন্য অপেক্ষা না করে মৌখিক ভাষাকেই গ্রহণ করেছিলেন।

অক্ষয়কুমার সেনের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' আবার বিপরীত ভঙ্গিতে লেখা। বাংলা পয়ারের সহজ ছন্দে মধ্যযুগীয় ছাঁচে রচিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনচরিতখানি উনিশ শতকে মধ্যযুগীয় ধারায় রচিত জীবনী-গ্রন্থরূপে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যধারার আর-একজন ভগীরথ—স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রচারের জন্য ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতে 'উদ্বোধন' পত্র প্রকাশের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়—ঐ পত্রের প্রথম সম্পাদক মনোনীত হন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। তাঁর লেখা 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সমালোচনা' চলিত ভাষার সপক্ষে লেখা একটি অসামান্য প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনি বর্ণমালা, ব্যাকরণ ও পরিভাষা নিয়ে অত্যন্ত আধুনিক মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে ব্যাকরণকে সহজতর করলে, বর্ণমালাকে সংক্ষেপিত করলে এবং প্রচলিত ইংরেজী শব্দের ব্যবহারে বাংলা ভাষার আরও উন্নতি হওয়া সম্ভব। পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রেও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ত্রিগুণাতীতানন্দ সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—যেমন দ্বিজেন্দ্রনাথ Division of labour-এর বাংলা করেন শ্রমের বিভাজন, ত্রিগুণাতীতানন্দ করেন শ্রমবিভাগ

Moral courage-কে দ্বিজেন্দ্রনাথ করেন সাত্ত্বিক সাহস, ত্রিগুণাতীতানন্দ লেখেন চরিত্রবল বা মনের তেজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথাপ্রসঙ্গে তাঁর সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর জীবনী-গ্রন্থের কথাও বলতে হবে। রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণা জগজ্জননী দেবী সারদামণিকে ঘিরে একটি শিষ্যামণ্ডলী গড়ে উঠেছিল। তাঁর অলৌকিক ভাবমূর্তি ও দিব্য চৈতন্যময় সত্তা নারীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের কাছে তিনি ছিলেন শক্তিরূপা মাতা, 'আমি সত্যিকারের মা ; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার মা নয়—সত্য জননী।' স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী সারদেশানন্দ, স্বামী অরূপানন্দ, স্বামী ঈশানানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ শ্রীমায়ের জীবনী রচনা করেছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ বিরচিত 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থখানি 'লীলাপ্রসঙ্গে'র মতোই গুরুত্বপূর্ণ আকর গ্রন্থ। স্বামী সারদেশানন্দের 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা' গ্রন্থখানি শ্রীমায়ের সর্বভাবের সর্বরূপের লীলার অগণিত চিত্রের একখানি সুন্দর 'অ্যালবাম' যেন। স্বামী অরূপানন্দের লেখা শ্রীমায়ের জীবনী-গ্রন্থ আকারে বৃহৎ না হলেও প্রামাণিক তথ্য সঞ্চয়নে অতি মূল্যবান—প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থও বটে। স্বামী ঈশানানন্দের 'মাতৃ-সান্নিধ্যে' করুণাময়ী শ্রীমায়ের অপূর্ব জীবনালেখ্য। স্বামী অরূপানন্দ, স্বামী সারদেশানন্দ ও স্বামী ঈশানানন্দ শ্রীশ্রীমাতৃকৃপাধন্য সাক্ষাৎ সন্তান। শ্রীমার আরও কয়েকজন সন্তানের স্মৃতিকথা আছে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র মতো 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'ও শ্রীমার লীলাচিত্র ও বাণী সঙ্কলন। সন্ন্যাসী, গৃহী মায়ের বহু সন্তানের স্মৃতিকথার সমাহারে রচিত এই দুইখণ্ড 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'। শ্রীমার কথাগুলি যেন সৌন্দর্য সুধায় নিষিক্ত, 'ছাখো, কথায় আছে যে, পুকুরে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে, তাই দেখে ছোট ছোট মাছেরা আনন্দে সেইখানে লাফালাফি করে খেলা করছে—ভাবছে আমাদেরই একজন। কিন্তু যখন চাঁদ অস্ত গেল তখন তাদের সেই পূর্ব অবস্থা। লাফালাফির পর অবসাদ এল—কিছুই বুঝতে পারলে না।' মহাপুরুষদের সেবায় রত ভক্তদের দুর্বুদ্ধি প্রসঙ্গে তাঁর এই উক্তিটির সাহিত্যিক মূল্য কি কম? অপরদিকে পতিতোদ্ধারিণী

শ্রীমা নিজের পবিত্র জীবনসাধনার কথাও ব্যক্ত করেছেন, 'যখন নবতে থাকতুম, রাতে যখন চাঁদ উঠতো, গঙ্গার ভিতর স্থির জলে চাঁদ দেখে ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে কত প্রার্থনা করতুম—চন্দ্রতেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোনো দাগ না থাকে।' ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী'-তেও বহু তথ্য আছে। আছে স্বামী তেজসানন্দের 'শ্রীমা ও সপ্তসাধিকা' এবং স্বামী নিরাময়ানন্দের 'শ্রীশ্রীমা সারদা' গ্রন্থেও। এ-সব গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়, আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হল মাত্র।

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যদের মধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী বিরজানন্দের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। শুদ্ধানন্দ দীর্ঘদিন 'উদ্বোধন' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব স্বামীজীর ইংরেজী রচনার অনুবাদ। তাঁকে 'রাজযোগ' অনুবাদ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বয়ং স্বামীজী। শুদ্ধানন্দও অতি আশ্চর্য নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে 'রাজযোগ', 'জ্ঞানযোগ', 'কর্মযোগ', 'ভক্তিযোগ' ও অন্যান্য অধিকাংশ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। স্বামীজীর ভাব, ভাষা ও ভাবনাকে তিনি তাঁর অনুবাদের মধ্যে এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে পড়বার সময় মনেই হয় না রচনাটি স্বামীজীর মূল রচনা নয়। স্বামীজীর নির্দেশে শুদ্ধানন্দ দিনপঞ্জী রাখতেন। তাঁর লিখিত দিনপঞ্জীতে মঠের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পাওয়া যাবে। তাঁর বহু পত্র এখনও প্রকাশিত হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দের মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত 'সন্ন্যাসীর গীতি' বাংলা কবিতা শুদ্ধানন্দেরই কবিপ্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন।

স্বামী বিরজানন্দ অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসুদের বিভিন্ন জটিল সমস্যাবলীর সমাধান করে দিতেন অতি সহজে। তাঁর 'পরমার্থ-প্রসঙ্গ' বা উপদেশ সঙ্কলন বহু ধর্মপিপাসুকে পরমার্থ পথের প্রেরণা দিয়েছে। তাঁর লেখা পত্রের মধ্যেও ছিল স্বামীজীর অপূর্ব বাচনভঙ্গি।

'বীর হওয়া চাই—সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করা চাই। আমি বড় দুর্বল, আমি কিছু করতে পারবো না, তুমি করে দাও, এ-সব ভাব ত্যাগ করতে না পারলে কোনো কালেই কিছু হবে না। উপদেশ তো তোমায়

যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। সে-সব যদি পালন করতে না পার তো কেউ তোমায় কিছু করিয়ে দিতে পারবে না। তোমায় যে-সব পত্র দিয়েছি, তা বারবার পড়বে ও সেইমতো চলতে চেষ্টা করবে। ঠিক ঠিক ধর্মলাভ বড় কঠিন কথা—সকলের হয় না। ভিজে অসার কাঠ হলে ঠাকুরও তার দিকে ফিরে চাইতেন না।'

অপর একটি পত্রে পাওয়া যায় ভিন্ন সুর, গাঙ্গেয় স্নিগ্ধতা-মণ্ডিত—'তুমি নিয়মিত জপধ্যান করছো জেনে প্রীত হলুম। তাঁর জন্যে যে কাঁদতে পারে সে তো মা ধন্য—সে পুরুষই হোক আর স্ত্রীলোকই হোক। প্রাণের আবেগই আসল কথা। প্রেমাশ্রু গঙ্গাজলের চেয়েও পবিত্র।'

উদাহরণ বৃদ্ধি করে লাভ নেই, শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের প্রত্যেক সন্ন্যাসীর পত্রে এক অত্যাশ্চর্য সাবলীল ভঙ্গি ও মাধুর্য-মিশ্রিত দৃঢ়তা দৃষ্টিগোচর হবে। কঠোরের সঙ্গে কোমলের সমন্বয়, ত্যাগ ও তিতিক্ষার সঙ্গে মানবপ্রেম ও মানবসেবার সমন্বয় ঘটেছিল জীবনে। তারই প্রভাব পড়েছে তাঁদের লেখা পত্রসম্ভারে, কিংবা বাণী-উপদেশে।

স্বামী বিবেকানন্দের কথা লিখেছেন আরও অনেকেই। স্বামী অভেদানন্দের 'স্বামী বিবেকানন্দ', স্বামী শ্রদ্ধানন্দের 'আচার্য বিবেকানন্দ', স্বামী প্রেমঘনানন্দের 'বিবেকানন্দের কথা ও গল্প', স্বামী অপূর্বানন্দের 'যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ', স্বামী বুধানন্দের 'স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণসাধনা' উল্লেখযোগ্য। স্বামী গম্ভীরানন্দের তিনখণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থ 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থরূপে অত্যন্ত মূল্যবান। ভগিনী নিবেদিতার 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' স্বামী মাধবানন্দের অনুবাদের সাহায্যে বাংলাভাষীদের নিকটে পৌঁছেছে। স্বামীজীর জীবনকথা রচনা করেছেন তাঁর অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত বা মহিমবাবু। তিনখণ্ডে 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী' ছাড়াও তিনি রচনা করেছেন 'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' (তিনখণ্ড), 'স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী' ও 'কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ'। স্বামী শঙ্করানন্দ তিনটি অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থ তিনটিতে

তাঁর গভীর জ্ঞান ও নৃতত্ত্ববিষয়ক মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এই তিনটি গ্রন্থের নাম 'বঙ্গে মহেঞ্জোডারো সভ্যতার বিস্তার', 'মনসা চরিত' ও 'নব বৃহত্তর ভারতের জন্ম'।

মঠবাসী স্বামীজীদের অনেকেই রচনা করেছেন স্মৃতিকথা ও ভ্রমণসাহিত্য। স্বামী অখণ্ডানন্দের অনুপম ভ্রমণকাহিনী 'তিব্বতের পথে হিমালয়ে'। অপর গ্রন্থটি 'স্মৃতি-কথা'। তাঁর ভাষার সারল্য ও মাধুর্য তুলনাহীন। পুনরায় 'স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়' রচনা করেছেন স্বামী নিরাময়ানন্দ আর জীবনীগ্রন্থ 'স্বামী অখণ্ডানন্দ' লিখেছেন স্বামী অন্নদানন্দ। স্বামী নিরাময়ানন্দ রচিত ভক্তিভাবমিশ্রিত কবিতাগুলি আধ্যাত্মিক বৈভবে পরিপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা এভাবেই সাহিত্যচর্চার ধারাটি অব্যাহত রেখেছেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ রচনা করেছেন 'অতীতের স্মৃতি', 'ঘরে চলো', 'বন্দি তোমায়' প্রভৃতি। তিনি দীর্ঘদিন 'উদ্বোধন' পত্রও সম্পাদনা করেছেন। 'ঘরে চলো'তে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বেদান্ততত্ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ রচিত কবিতাগুলি উচ্চ বেদান্তভাবোদ্দীপক—অথচ প্রেম-ভক্তির স্বচ্ছ নির্ঝরিণীস্বরূপ। ভাষ্যসহ 'বেদান্তদর্শন' অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন স্বামী বিশ্বরূপানন্দ। শিশুদের জন্যে 'গল্পে বেদান্ত' রচনা করেছেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। তিনি শিশুদের জন্যে আরও কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ভগবদ্গীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী অনুবাদ করেছেন—যা আদ্যোপান্ত সংশোধিত ও সম্পাদিত হয়েছে স্বামী জগদানন্দের দ্বারা। তাঁর অন্যান্য অনুবাদের মধ্যে 'চৈনিক ঋষি লাউৎজে' উল্লেখযোগ্য। তিনি লাউৎজের জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করার পর উপদেশগুলির সরল বঙ্গানুবাদ করেছেন।

'আমরা অজ্ঞান—ইহা উত্তমরূপে জানা (হৃদয়ঙ্গম করা) একটি উচ্চ সাধনা, অজ্ঞানকে জ্ঞান মনে করা একটি মস্ত বড় দোষ। এই দোষের ব্যথা অনুভব করাই ইহা দূরীকরণের প্রথম সোপান।

'অপ্রশমিত বাসনার চেয়ে অধিক পাপ আর নাই। অসন্তোষ অপেক্ষা অধিকতর মন্দ আর নাই। লাভের লোভ অপেক্ষা

অধিকতর দোষ আর নাই। সন্তোষের প্রাচুর্যে প্রত্যেক বাসনা পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসীবৃন্দের উদারতা বিস্ময়কর। যে কোনো ধর্মের আচার্যকে এবং তাঁর উপদেশকে তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কথা আলোচনা করেছেন। স্বামী প্রভবানন্দের 'বেদান্তের আলোকে খ্রীস্টের শৈলোপদেশ' এই ধারায় অভিনবত্ব এনেছে। 'আচার্য শঙ্করে'র জীবনী রচনা করেছেন স্বামী প্রেমেশানন্দ, স্বামী অপূর্বানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ। রামানুজের বৃহৎ প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের, স্বামী প্রেমেশানন্দ-রচিত ছোট আকারের জীবনীটিও উপাদেয়। 'সাধক রামপ্রসাদ' লিখেছেন স্বামী বামদেবানন্দ।

স্বামী প্রেমেশানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যধারায় সঙ্গীত শাখাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর রচিত কবিতাগুলিও ভাবসম্পদে অসাধারণ—'চারিধাম' স্মরণীয়। তাঁর 'পরমহংসদেব' প্রেম ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়। স্বামী প্রেমেশানন্দ-প্রণীত আরও কয়েকখানি পুস্তক আছে। তাঁর প্রাক্-সন্ন্যাস জীবনে রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' সম্ভবত উদ্বোধন কার্যালয়-প্রকাশিত সর্বপ্রথম স্বামীজীর জীবনী। স্বামী প্রেমেশানন্দের 'গীতাসার-সংগ্রহ' ও 'আত্মবিকাশ' কিশোর সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত দুইখণ্ডে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার ইতিহাস জানতে ইচ্ছুক পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অবশ্যপাঠ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তগণের সুললিত জীবনী বর্ণিত হয়েছে ঐ গ্রন্থদ্বয়ে।

স্বামী চণ্ডিকানন্দের 'পাঞ্চজন্য' পাঁচশত ভক্তি সঙ্গীতের সঙ্কলন। স্বামীজীর সন্ন্যাসী-শিষ্যদের জীবনকথা প্রণয়ন করেছেন স্বামী অব্জজানন্দ। তাঁর রচিত 'স্বামিজীর পদপ্রান্তে' গ্রন্থটিতে স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বিমলানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী বোধানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী কল্যাণানন্দ, স্বামী নিশ্চয়ানন্দ, স্বামী অচলানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী পরমানন্দের

জীবনকথা আলোচনা করেছেন। এঁদের জীবনকথা অনেকেরই অজানা অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচারের ইতিহাসে এঁদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

স্বামী প্রভানন্দ রচনা করেছেন 'ব্রহ্মানন্দ চরিত'। ঈষৎ ভিন্ন ধরনের গ্রন্থ স্বামী সিদ্ধানন্দ সংগৃহীত 'সৎকথা', স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের 'পুণ্যস্মৃতি', স্বামী পরমানন্দের 'প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা' ও স্বামী বীরেশ্বরানন্দের 'ভগবান লাভের পথ' শুধু অধ্যাত্মচিন্তা নয়, সাহিত্যক্ষেত্রেও অভিনবত্ব এনেছে। স্বামী অপূর্বানন্দের অপূর্ব ভ্রমণকাহিনী 'কৈলাস ও মানসতীর্থ' ভ্রমণসাহিত্য হিসেবে সুখপাঠ্য। স্বামী প্রজ্ঞানন্দের 'ভারতের সাধনা' বাংলাসাহিত্যের একখানি আলোড়নকারী গ্রন্থ। স্বামী সারদেশানন্দের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব' বাংলা জীবনীসাহিত্যে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ।

এভাবে দেখা যাবে, সাধিকা সন্ন্যাসিনীদের জীবনচরিতও লেখা হয়েছে। অধিকাংশ গ্রন্থই শ্রীমায়ের স্মৃতিকেন্দ্রিক। গৌরী মা, গোপালের মা-র কথা ছাড়াও ভগিনী নিবেদিতার রচনার অনুবাদ ও তাঁর জীবনী রচনাতে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নিষ্ঠা চোখে পড়ার মতো। এ প্রসঙ্গে 'উদ্বোধন' ও 'বিশ্ববাণী' পত্রিকাদুটির নিরলস প্রয়াস কম নয়। অধুনালুপ্ত 'তত্ত্বমঞ্জরী' (১৮৮৫-৮৭) পত্রিকাও অতীতে এই ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

আপাতদৃষ্টিতে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁর লীলা-পার্ষদমণ্ডলীর ভূমিকা বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে বোঝা যায় না। মনে হয়, বাংলাসাহিত্য যখন বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের অকুণ্ঠিত দানে পরিপূর্ণ, তখন সংসারবিমুখ গৈরিক বস্ত্রধারী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আর কিভাবে সাহিত্যের রস-ভাণ্ডার পূর্ণ করবেন? কিন্তু ভালভাবে পর্যালোচনা করলেই তাঁদের দানের অপরিসীম মূল্য হৃদয়ঙ্গম হয়। অবশ্য বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দ স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। তবে অন্যান্যদের রচনার তাৎপর্য বা সাহিত্যমূল্য বিচারের চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়, সঙ্গীতশাস্ত্রকে তিনি সহজবোধ্য

পরিবেশনার মাধ্যমে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন কিনা তা নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। শ্রীচৈতন্যের জীবনীসাহিত্য মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে যে ধরনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ-শতকের প্রথমদিকের ইতিহাসেও কি এই গ্রন্থগুলি সেরূপ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি ?

বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রভাব অনুভূত হয়। তাঁর আবির্ভাব ক্রমক্ষীয়মাণ সাধকজীবনী রচনার ধারাটিকে পুনর্জীবিত করেছে। ধর্মীয় জীবনালোচনার ধারাটি প্রায় হারিয়ে যেত যদি-না শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যমণ্ডলী অব্যাহতভাবে ঐ ধারায় রস-সিঞ্চন না করতেন। তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেকেই এই ধারায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, গবেষণার মধ্য দিয়ে ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের সমসাময়িক তথ্যাদি আবিষ্কারেও মনোযোগী হয়েছেন অনেকে। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষায় গভীর তত্ত্বাদি আলোচনায় এবং সংস্কৃতসাহিত্যের ব্যাপক অনুবাদের মধ্যে বিশুদ্ধ সাধুভাষার ব্যবহারে উক্ত সন্ন্যাসীবৃন্দ বাংলাসাহিত্যে প্রচলিত দুটি লেখ্যরীতিকেই পুষ্ট করেছেন। অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমার বাণী ও উপদেশের মধ্যে মৌখিক চলিত ভাষার ঢঙটি সমৃদ্ধ হয়েছে। আমাদের সাহিত্যিক চলিত ভাষা সব সময় মৌখিক চলিত ভাষা নয়, বরং অনেক সময় সাজানো-গোছানো কৃত্রিমতায় পূর্ণ। কিন্তু 'কথামৃত', 'মায়ের কথা', কিংবা স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্যদের লেখা চিঠিপত্রের ভাষা এই ধরনের কৃত্রিমতা থেকে সম্পূর্ণভাবে এবং স্বাভাবিকভাবেই মুক্ত। প্রাত্যহিক জীবন থেকে নেওয়া অজস্র উপমা-রূপক-প্রবাদ-প্রবচন মণিমুক্তার মতো এই গ্রন্থগুলিতে দীপ্যমান রয়েছে, আমরা অনেক সময়েই সেগুলির সন্ধান রাখি না বলে তাদের সদ্ব্যবহার করতে পারি না, সাহিত্য হিসেবেও তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দিই না। দ্বিতীয়ত, এই মহাপুরুষদের জীবনচর্চা, দর্শনালোচনা হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ও প্রাচীন শাস্ত্রাদির নির্ভুল অনুবাদ, বুদ্ধ-শঙ্কর প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মগুরুর জীবনা-লোচনা একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যাদর্শ ও পাঠকমণ্ডলী গড়ে তুলেছে।

পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চাতেও তাঁদের যে অবাধ অধিকার ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। শুধুমাত্র 'ধর্মালোচনা' বলে এই সাহিত্যসৃষ্টিকে আমরা দূরে সরিয়ে রাখতে পারি কি? ব্রতকথা-পাঁচালীর মতো ফুল-বেলপাতা দিয়ে লক্ষ্মীর পটের অন্তরালে চাপা দিয়েও কি রাখতে পারি? পালিসাহিত্য যেমন বৌদ্ধ বিহারগুলির নিজস্ব বস্তু হয়েও সর্বসাধারণের আস্বাদ্য হয়ে উঠেছিল, গোস্বামীদের রচিত চৈতন্য জীবনী গ্রন্থগুলি যেমন সর্বসাধারণের পাঠ্য হতে পেরেছিল, মঠবাসী সন্ন্যাসীদের রচিত ও আলোচিত গ্রন্থগুলিও সেভাবে সকলের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে, রসসাহিত্য না হলেও এই রচনাগুলি নীরস ও তত্ত্ব-উপদেশের ভারে ভারাক্রান্ত নয়, বরং অভিনব জীবনরসের সন্ধান দান করে পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের 'কমলবনে' বিচরণশীল পাঠকের 'মত্তমধুপচিত্ত' এগুলির মধ্যে স্বর্গীয় পারিজাতের সুধা লাভ করতে পারবে। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সেবার মহৎ আদর্শ আমাদের মুগ্ধ করে, অভিভূত করে। স্বার্থ-বিরহিত নিষ্কাম মানবপ্রেমে মহীয়ান গ্রন্থগুলি জীবনের তাৎপর্য সন্ধানে সাহায্য করে। বিদগ্ধ সমাজে এই ধরনের গ্রন্থাদির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকের অবক্ষয়ী সমাজের চারিত্রিক মেরুদণ্ড পুনর্নির্মাণের যদি চেষ্টা করা হয়, তাহলে সে পথে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাবিত বাংলাসাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী

ভারতীয় সাহিত্যে জীবনী-সাহিত্য রচনার ধারাটি খুব প্রাচীন। যতদূর মনে হয়, এদেশে জীবনী-রচনার সূত্রপাত হয়েছিল বৈদিক যুগে। ঋগ্বেদ সংহিতার কোনো কোনো সূক্তের দেবস্তবে দেখা যায়, মাহাত্ম্য বর্ণনা উপলক্ষে তাঁদের জন্ম থেকে কীর্তিকথা সংক্ষেপে বর্ণিত হচ্ছে। এই দেবতার বিজ্ঞাপিকাই হল জীবনী-সাহিত্য রচনার আদিরূপ। অন্যান্য দেশেও এ-জাতীয় উদাহরণ বিরল নয়। এমনও ধারণা করা চলে, পৃথিবীর সব দেশেই দেবতা বা দেবকল্প মানবের জীবনচরিত রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল। এক হিসেবে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, বিভিন্ন পুরাণ, এমনকি বৌদ্ধ জাতকও জীবনী-সাহিত্য।

বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে, মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে জীবনী-সাহিত্য রচনার কোনো চেষ্টা শুরু হয়নি। যদিও রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবত রচনার ধারাটি অব্যাহত ছিল। বাংলা-দেশে আধ্যাত্মিক জীবন-সাধনার প্রেরণারূপে এসেছিলেন দুজন অলোক-সামান্য প্রতিভার অধিকারী দেবোপম মানব। তাঁরা শুধু ধর্ম-সম্পর্কিত চিন্তার ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র দেশবাসীর জীবনে ও মননে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। সংক্ষেপে বলা যায়, বাঙালীর চিত্তলোক যে দুটি নবজাগরণের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, তার হৃদয় মন্থন করে যে অমৃত উঠেছিল তারই ঘনীভূত রসরূপ পরিগ্রহ করেছিলেন এই দুই দেবকল্প মহামানব—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

ভারতবর্ষে পূর্বে অবতাররূপে যে মহাপুরুষেরা এসেছিলেন তাঁরাই ছিলেন মহাকাব্যের নায়ক। কিন্তু দশাননজয়ী অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র

ও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধনিয়ন্তা দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য আছে। বরং সাদৃশ্য আছে ভিক্ষু সন্ন্যাসী বুদ্ধদেবের সঙ্গে, জৈন তাপস মহাবীরের সঙ্গে। এঁদের আবির্ভাব আলোড়ন জাগিয়েছিল উত্তর ভারতে। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে সেদিন ধন্য হয়েছিল বাঙালীর জীবন, ধন্য হয়েছিল সমগ্র বঙ্গদেশ। শ্রীচৈতন্যের অলোকসামান্য জীবনচরিত রচনার মধ্য দিয়েই বাংলায় জীবনী-সাহিত্য রচনার সূচনা হয়। তাই বাংলা চরিত-সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যজীবনীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য গতানুগতিক তুচ্ছতা থেকে মুক্তিলাভ করে। সেই সময় তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মানবলীলার অপূর্ব বৃত্তান্ত লিখে রাখার আগ্রহ তাঁর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে দেখা দেয়। জীবিত বা অল্পকাল পূর্বে লোকান্তরিত কোনো মহামানবের জীবনী রচনা ও তাঁর সাধনার দার্শনিক ব্যাখ্যাদানের চেষ্টাও শুরু হয় তখন থেকেই। বলা বাহুল্য আধুনিক যুগে আমরা যাকে জীবনী-সাহিত্য বলে থাকি, চৈতন্যজীবনীগুলি সে-জাতীয় যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ জীবনীগ্রন্থ হয়নি। বরং এদের তুলনা করা যায় য়ুরোপীয় হ্যাজিওগ্রাফী বা সন্তজীবনী-গুলির সঙ্গে। এ-জাতীয় গ্রন্থে সাধকের ভাবজীবনই প্রাধান্য লাভ করে, বাস্তবজীবন নয়। শ্রীচৈতন্যদেবও ভক্তদের কাছে ছিলেন 'ভাবের মূরতি', কিছু বাস্তব ও কিছু কল্পনায় মেশা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য জীবন ও লীলামাহাত্ম্যও আধুনিক মানুষের কাছে পরম বিস্ময়। তিনি শুধু অবতার নন, অবতারবরিষ্ঠ। সুতরাং তাঁর জীবন ও সাধনা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে প্রচণ্ড আগ্রহ ও কৌতূহল থাকাই স্বাভাবিক। তাঁর লীলাবসানের পর তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের অন্তরেও জাগ্রত হচ্ছিল তাঁর জীবনলীলা প্রকাশের ঐকান্তিক বাসনা।

চৈতন্য-জীবনীকারদের সামনে জীবনী রচনার কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না, কিন্তু উনবিংশ শতকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী রচনার সময় এদেশে জীবনী রচনার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় রীতিই বেশ পরিচিত।

বিশেষ করে ব্রাহ্ম লেখকেরা দেশীয় মহাপুরুষদের জীবনী রচনায় অত্যন্ত উৎসাহবোধ করতেন। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় লেখকদের অনুসরণেই তাঁরা সমসাময়িক ও অনতিকাল-পূর্ববর্তী বাঙালী মনীষীদের জীবনী রচনায় মনোনিবেশ করেন। বাংলাসাহিত্যের এই নতুন শাখাটি তাঁদের হাতেই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রথম বাণী সঙ্কলক ও জীবনী লেখকও জনৈক ব্রাহ্ম মনীষী গিরিশচন্দ্র সেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নির্দেশে 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী সঙ্কলন করেন। পরে এই সঙ্কলন 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় ছিল ১৮৪টি প্রশ্ন ও তার উত্তর। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের অব্যবহিত পরে এই পুস্তিকায় সংযোজিত হয় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

সুরেশচন্দ্র দত্তের 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে। পরে তিনিও গ্রন্থটিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে পুনঃপ্রকাশ করেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ' নামে। স্বতন্ত্র আকারে ঠাকুরের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখেন রামচন্দ্র দত্ত। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থে তিনি ঠাকুরের বাল্যলীলা ও সাধন-ভজনের বৃত্তান্ত এবং তাঁর পরবর্তী জীবনের যে-সব ঘটনাবলী রামচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা প্রকাশ করেন।

এর কয়েক বছর পরে অক্ষয়কুমার সেন বাংলা পয়ারের সহজ ছন্দে লিখলেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'। পুরনো রীতিতে লেখা হলেও এই গ্রন্থটি অতীব সুন্দর, সুললিত ও সুখপাঠ্য। স্বামীজী তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে লিখেছিলেন, 'তার কণ্ঠে তিনি আবির্ভাব হচ্ছেন।' শুধু তাই নয়, পরবর্তী খণ্ডে লেখবার জন্যে কিছু কিছু নির্দেশও পাঠিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমারের পুঁথিতে শ্রীমা সারদা-দেবীর কথা বিশেষ ছিল না। স্বামীজীর নির্দেশে তিনি গ্রন্থে মাতৃস্তব সংযোজন করেন।

এ-সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যেরা তাঁদের গুরুদেবের

জীবনচরিত রচনায় হস্তক্ষেপ করেননি। বরং স্বামীজী প্রথমদিকে তাঁর গুরুভাইদের এ-ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে একপ্রকার নিষেধ করেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন, 'তাঁর জীবনচরিত যে কেউ লিখবে, তার সঙ্গে তোমরা নিজেদের জড়িত করো না বা তা অনুমোদন করো না।' গুরু-ভাইদের এভাবে সাবধান করে দিলেও এ-সময় থেকেই স্বামীজী ঠাকুরের জীবনী রচনার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন, 'আমি একটা পরমহংস মহাশয়ের জীবনচরিত লিখে পাঠাব। সেটা ছাপিয়ে ও তর্জমা করে বিক্রি করবে।' স্বামীজীর লেখা ঠাকুরের জীবনের সেই সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রই তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যের আঁকা প্রথম জীবনচিত্র।

ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী গ্রন্থ প্রথম রচনা করেন ম্যাক্সমূলার। তবে সংক্ষেপে The Hindu Saint নামে ঠাকুরের সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে। এই প্রবন্ধই Paramhansa Ramkrishna নামে পুস্তিকাকারে পুনঃ-প্রকাশিত হয়েছিল। ম্যাক্সমূলার এই পুস্তিকা পাঠ করে প্রথমে একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংক্রান্ত আরও বহু তথ্য সংগ্রহ করে রচনা করেন Ramkrishna : his life and sayings। তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম বিদেশী জীবনীকার। স্বামীজীর নির্দেশে ম্যাক্সমূলারকে ঠাকুরের জীবনী-সংক্রান্ত কিছু কিছু কাগজপত্র ও তথ্য বেলুড় মঠ থেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন স্বামী সারদানন্দ। পরে এই তথ্য সংগ্রহই তাঁর নিজস্ব গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' রচনার কাজে লাগে।

এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাণী ও উপদেশ সঙ্কলনের কাজও শুরু হয়েছিল। ভক্ত-সাধারণের কাছে মহাপুরুষের জীবন ও বাণী সমার্থক। তাই ঠাকুরের জীবনী রচনারও আগে শুরু হয়েছিল তাঁর অমৃতোপম বাণী সঙ্কলন। এ-জাতীয় সব গ্রন্থকে না হোক শ্রীম-সঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-কে সকলেই জীবনীগ্রন্থের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। অভিভূত হয়ে শ্রীম-কে জীবনীলেখক

বস্ওয়েলের সঙ্গে তুলনা করেছেন অল্ডাস হাক্সলি।

মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসেন ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে। এই সময় থেকে ঠাকুরের দেহাবসানের সময় পর্যন্ত শ্রীম অন্তরঙ্গ পার্ষদের মতোই তাঁকে দর্শন করেন ও দিনলিপিতে সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিখে রাখেন। এই সাক্ষাৎকারের যথাযথ বিবরণই কথামৃত নামে বিখ্যাত। প্রথমে মহেন্দ্রনাথ এই দিনলিপি প্রকাশের কথা ভাবেননি, কিন্তু শ্রীমার আদেশে তিনি গ্রন্থাকারে এই সাক্ষাৎকার বিবরণ প্রকাশে সম্মত হন। মনে হয়, তিনি ইচ্ছে করেই ঠাকুরের লীলাবসানের একেবারে শেষের পর্বটি বাদ দিয়েছিলেন।

কথামৃতে ঠাকুরের জীবনের বহু ঘটনার বিবরণ ছাড়াও আছে তাঁর অমূল্য উপদেশ, অমৃতোপম বাণী, আছে তাঁর আত্মস্বরূপের কথা। ভক্তদের কাছে তিনি তাঁর নিজের জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা ব্যক্ত করেছেন। ঠাকুরকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ তাঁর চেতনার স্তর সাধনার উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত। খণ্ডিত মানবের পক্ষে সেই পূর্ণ মানবকে উপলব্ধি করে সেই অভিজ্ঞতা নিজের ভাষায় প্রকাশ করা কখনই সম্ভব হত না যদি-না তিনি নিজেই নিজের পরিচয় ভক্তদের জানিয়ে যেতেন। অথচ জীবনী-কারকে, তিনি যাঁর জীবনচরিত রচনা করবেন, তাঁর বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতেই হবে। কোনো মহাত্মা বা ধর্মগুরুর জীবনী রচনায় এটি একটি বিরাট বাধা। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, অধিকাংশ গ্রন্থেই শ্রীরামকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। ঠাকুরের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি কারও পক্ষে। সৌভাগ্যক্রমে কথামৃতে তিনি স্বয়ং জীবনচরিত রচনার বহু সূত্র রেখে গিয়েছেন। সেজন্যে পরবর্তী লেখকেরা সকলেই শ্রীম-র কথামৃতের সাহায্য নিয়ে ঠাকুরের জীবনী রচনা করেছেন।

মহেন্দ্রনাথের অনুরোধে স্বামী অভেদানন্দ 'কথামৃতে'র ইংরেজী সংস্করণটি সম্পাদনের ভার নেন ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে। স্বামী নিখিলানন্দের সম্পাদনায় ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে যে ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে

সাল তারিখ অনুযায়ী ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলা কথামৃতে এই বিবরণ সাজানো নেই। পৌনঃপুনিকতা এবং প্রায় একই ধরনের বর্ণনাও দুর্লভ নয়। পড়তে পড়তে মনে হয়, কথামৃত যেন সদ্য আহরিত ফুল, সাজিয়ে-গুছিয়ে একটি তোড়ায় বাঁধা হয়নি। কিন্তু তাতে এখন সদ্য-তোলা ফুলের সতেজ ভাব, ভোরের শিশির লেগে রয়েছে। অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনের সমস্ত ঘটনা, সমস্ত বিবরণকে যথাযথভাবে সাজিয়ে গ্রন্থিত করেছেন স্বামী সারদানন্দ।

বাংলা জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে'র মূল্য অপরিসীম। স্বামী সারদানন্দ এই মহাগ্রন্থটি রচনা শুরু করেন ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে। অন্যদিক থেকেও গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য ; কেননা এতদিন ধরে এবং এরপরেও বহুদিন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনচরিত-লেখকরা সকলেই ছিলেন গৃহী ভক্ত। কথামৃতও গৃহী ভক্তের দৃষ্টিতে দেখা ও তাঁদের জন্যেই লেখা। এ-সময় আরও অনেকেই ঠাকুরের জীবনচরিত লেখার চেষ্টা করেন। 'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশের ফলে এ-আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্যদের মধ্যে সত্যচরণ মিত্র ও গুরুদাস বর্মণের গ্রন্থের নাম স্মরণীয়। সত্যচরণ মিত্রের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' ছাপা হয় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে, গুরুদাস বর্মণের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত' ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে। আরও কয়েকজনের কথা আগেই বলেছি। প্রথমদিকে লেখা ঠাকুরের এইসব জীবনীগ্রন্থই প্রধানত শ্রুতিনির্ভর বিবরণ সংগ্রহ করে লেখা হয়। সত্যচরণ লিখেছেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের বিশেষ বন্ধু—ডমরু শ্রীমহিমচন্দ্র নকুলাবধূত মহাশয়ের ঋষিতুল্য মুখ হইতে শুনিয়া' এবং গুরুদাস বর্মণের প্রধান অবলম্বন ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা। অবশ্য তিনি তৎকালে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থও দেখেছিলেন। অক্ষয়কুমার সেন শিহড় অঞ্চলের অনেক চাক্ষুষ বিবরণ সংগ্রহ করেন। আরও কয়েক বছর পরে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় কলকাতায় এসে শ্রীম-র নির্দেশে দক্ষিণেশ্বর ও নিকটবর্তী অঞ্চলের বহু বৃদ্ধ ও প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে

থেকে ঠাকুরের জীবনী রচনার ও অবতারত্বের বিবরণ সংগ্রহ করেন। অনেক সময় কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির অন্তরালে ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকে। সুতরাং এরও মূল্য আছে, কিন্তু জীবনীগ্রন্থ হিসেবে এ-জাতীয় কোনো গ্রন্থকেই প্রামাণিক বলা চলে না।

স্বামী সারদানন্দের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছিল অনেক আগে। তবু তিনি প্রথমে ঠাকুরের জীবনী লেখার কাজে হাত দেননি। 'উদ্বোধন' পত্রিকার ভার তাঁর হাতে ছিল এবং এ-সময় তিনি লক্ষ্য করেন, সাধারণ মানুষের মনে ঠাকুরের জীবন সম্বন্ধে প্রবল ঔৎসুক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলি তাদের যথাযথ কর্তব্য পালন করতে পারছে না। তাঁর নিজের কথায়, 'উদ্বোধনে ছাপাবার জন্যে ঠাকুরের সম্বন্ধে তখন নানারূপ প্রবন্ধ আসত। সবগুলিই এত অধিক ভ্রমপূর্ণ যে কেটে-ছেঁটে সম্পূর্ণ নতুন করে লিখতে হত। আমার কেবলই মনে হত, আমরা থাকতেই এতটা ভুল প্রচারিত হবে?'

এ-ছাড়াও আরও কিছু কিছু কারণ ছিল। সেইজন্যে স্বামী সারদানন্দ স্বয়ং এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং ১৯০৯ থেকে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর ধরে তিনি যে মহাগ্রন্থ রচনা করলেন সেটি হল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'।

স্বামী সারদানন্দ ঠাকুরের জীবনকথা অতি-বিস্তৃতভাবে অনুপুঙ্খ বর্ণনাসহ উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর রচনা যুক্তিনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক সত্য-নির্ভর অথচ ঐকান্তিক ভক্তিনম্রতায় সমুজ্জ্বল। ঠাকুরের দৈনন্দিন জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন-সংক্রান্ত সমস্ত কিছু জ্ঞাতব্য বস্তুর আকর গ্রন্থরূপে আমরা লীলাপ্রসঙ্গকে গ্রহণ করতে পারি। মধ্যযুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মতো দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করে যে দুরূহ কর্ম সম্পাদন করেছিলেন এযুগে স্বামী সারদানন্দও ততোধিক কঠিন কাজ সম্পন্ন করলেন লীলাপ্রসঙ্গ রচনা করে। তাঁর মনস্বিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লীলাপার্ষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ-গ্রন্থকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদর্শন হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনেকে বুঝতে

পারেননি। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বোঝা সম্ভবও হয়নি সবসময়। অনেকে মনে করতেন, তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তি—যাঁর সাম্প্রদায়িক মত বা দল সৃষ্টি করাই প্রধান লক্ষ্য। স্বামী সারদানন্দ স্থির করলেন এই ভ্রান্ত ধারণাও দূর করতে হবে। 'ঐ অলোকসামান্য জীবনের সহিত সনাতন হিন্দু বা বৈদিক ধর্মের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট নির্দেশ করিয়া কেহই এ পর্যন্ত উহার অনুশীলন করেন নাই।' বলা বাহুল্য স্বামী সারদানন্দ এ-কাজটিও সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

লীলাপ্রসঙ্গ পড়বার সময় প্রথমে মনে হতে পারে, এ-গ্রন্থটিও হ্যাজিওগ্রাফীর মতো শুধুই সন্তজীবনী। ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যের আঁকা সাধকজীবনের চিত্র। আসলে কিন্তু তা নয়। সকলের জীবন যেমন এক ছাঁচে গড়া নয়, তেমনি সকলের জীবনচরিত একই ধরনের হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। রবীন্দ্রনাথও এই নির্দিষ্ট মাপকাঠির বিরোধিতা করেছেন যীশুখ্রীস্ট ও রথচাইল্ড-এর জীবনচরিত একরকম হবে না বলে। স্বামী সারদানন্দ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক মননসম্পন্ন এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যও ঠাকুরের জীবন-সংক্রান্ত যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা দূর করা। তাই তীক্ষ্ণধী গবেষকের মন নিয়ে প্রতিটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ না করে তিনি কোনো তথ্য বা কোনো সংবাদ গ্রহণ করেননি। বরং জোর দিয়ে বলেছেন, 'লীলাপ্রসঙ্গের কোনো কথা আমি না জেনে লিখিনি।' তাঁর এই সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ় উক্তির মধ্যেই গ্রন্থটির প্রকৃত পরিচয় নিহিত রয়েছে।

অবশ্য স্বামী সারদানন্দের উক্তির আলোকেই আমরা বুঝতে পারি এই মহান জীবনীগ্রন্থখানির সীমাবদ্ধতা কোথায়। এ-গ্রন্থে বিবৃত সব বিবরণই সত্য, কিন্তু পূর্ণ নয়। তিনি নিজেই বলেছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র সম্পর্কে আমরা যতদূর বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি, সমধিক সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিকতর ভাবে উহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন। অতএব ঐ দেবচরিত্র বুঝিবার জন্য আমরা নিজ নিজ মন বুদ্ধির প্রয়োগ করিলে

উহাতে দূষ্য কিছুই নাই; কেবল ঠাকুরের চরিত্রের সবটা বুঝিয়া ফেলিয়াছি এ কথা মনে না করিলেই হইল!'

লীলাপ্রসঙ্গের খণ্ডগুলির ধারাবাহিকতা একত্রে পড়লে ক্ষুণ্ণ হয় না, কিন্তু স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থ লেখবার সময় গুরুভাব ও সাধকভাবে পূর্বে লিখেছিলেন, অর্থাৎ যা গৃহী-ভক্তদের পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয়নি সেই অংশ পূর্বে রচনা করেন। পরে তিনি ঠাকুরের বাল্য ও কৈশোরের কথা বর্ণনা করেন। এর ফলে গ্রন্থখানির ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। তবে ঠাকুরের অন্ত্যলীলার বিস্তৃত বিবরণ এ-গ্রন্থে নেই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের মতোই এ-গ্রন্থও অসম্পূর্ণ।

স্বামী সারদানন্দকে গ্রন্থখানি শেষ করার জন্য অন্য সন্ন্যাসীরা অনুরোধ জানালে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আর বোধ হয় হবে না! সেরূপ প্রেরণাই পাচ্ছি না। ঠাকুরের যতটুকু ইচ্ছে ছিল করিয়ে নিয়েছেন।' এখানেও নিরভিমানী সন্ন্যাসীর চারিত্রিক দার্ঢ্য ও সত্য-নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের আরেকবার পরিচয় হয়। শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর বরপুত্রের গ্রন্থখানি শুনতে ভালবাসতেন এবং বলতেন, 'শরতের বইয়ে সব ঠিক ঠিক লিখেছে।' তাঁর দেহাবসানের পর স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থ শেষ করবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। তাই মনে হয়, শ্রীমার আশীর্বাদ ও আগ্রহই ছিল তাঁর প্রেরণা।

লীলাপ্রসঙ্গের ভাষাশৈলী, উপস্থাপনারীতি, রচনারীতি প্রভৃতি বহুদিক থেকে সাহিত্যিক আলোচনা সম্ভব। আমার মনে হয়, সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থখানিকে নিয়ে বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে। স্বল্প অবকাশে এখানে সে সুযোগ নেই। লীলাপ্রসঙ্গের অন্যান্য বহু বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আর-একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এর ভাষা। বিষয় যেখানে জটিল, ভাষাও সেখানে গুরুগম্ভীর। আবার ঠাকুরের লীলামাহাত্ম্য বর্ণনা অংশে তাঁর ভাষা সহজ সাধুগদ্য। কোথাও ভাষা অস্পষ্ট বা আড়ষ্ট নয়। পড়তে পড়তে মনে হয়, তিনি যেন প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যক্তি ও ঘটনার বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। ঠাকুর ও শ্রীমার জীবনবৃত্তান্ত ও বহু খুঁটিনাটি ঘটনা তিনি সংগ্রহ করে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করেন। আজ

পর্যন্ত ঠাকুরের যত জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়েছে তাদের কোনটির সঙ্গেই লীলাপ্রসঙ্গের তুলনা করা চলে না। বাংলা জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসেও এ-ধরনের গ্রন্থ বিরল।

লীলাপ্রসঙ্গের পরেও ঠাকুরের বহু জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। শুধু বাংলা গ্রন্থেরই সংখ্যা প্রায় দুশো। অবশ্য সব গ্রন্থই যে জীবনী তা নয়, বিভিন্ন দিক থেকে তাঁকে দেখার চেষ্টা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশের সংখ্যাও কম নয়। এখানকার একটি গ্রন্থাগারে অসমীয়া ভাষায় তিনটি, মালয়ালম ভাষায় দশটি, তামিল ভাষায় আটটি, উর্দু ভাষায় একটি, গুজরাটী ভাষায় সাতটি, হিন্দী ভাষায় চৌদ্দটি, মারাঠী ভাষায় ন'টি, ওড়িয়া ভাষায় চারটি, কানাড়ী ভাষায় তেরোটি ও সংস্কৃত ভাষায় ষোলটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী-সংক্রান্ত বইয়ের খোঁজ পাওয়া গেছে। এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি হতে পারে।

এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে বিদেশী বইয়ের কথা। ইংরেজীতে বহু বই লেখা হয়েছে। ম্যাক্সমূলারের গ্রন্থের কথা আগেই বলেছি, তাঁর গ্রন্থ পাঠ করে স্বামীজী অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেছিলেন। তাঁর পরেই আমরা রোমাঁ রোলাঁর গ্রন্থখানির উল্লেখ করতে পারি। তার আগে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের Sri Ramakrishna : Face of Silence-এর নাম করা যায়। ঠিক জীবনী না হলেও সশ্রদ্ধ অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ধনগোপাল ঠাকুরের লীলাবসানের বেশ কয়েক বছর পরে ভারতে এসে তাঁর সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি সংগ্রহ করেন। রোমাঁ রোলাঁ ধনগোপালের বই পড়েই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কৌতূহলী হন ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাহায্যে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। তখনও লীলাপ্রসঙ্গের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। তিনি শুধু দুটি খণ্ড দেখেছিলেন। ভারতবর্ষে দু-হাজার বছর ধরে যে আধ্যাত্মিক জীবনধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলেছে শ্রীরামকৃষ্ণকে তারই মূর্ত প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন রোমাঁ রোলাঁ। স্বামী জগদানন্দের অনূদিত Shri Ramakrishna : the Great Master 'লীলাপ্রসঙ্গে'র সার্থকতম অনুবাদ। ইংরেজীতে

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংক্রান্ত গ্রন্থের সংখ্যাও শতাধিক। এ-প্রসঙ্গে ক্রিস্টোফার ইশারউডের গ্রন্থটির উল্লেখ অবশ্যই করব। তবে লেখক নিজেই জানিয়েছেন, এ-গ্রন্থে নতুন কোনো তথ্য দেবার চেষ্টা তিনি করেননি, লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃতই তাঁর গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন। ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জাপানী ও চীনা ভাষাতেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী প্রকাশের খবর পাওয়া গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃত অবলম্বনে ঠাকুরের জীবনী রচনা করা হয়েছে। বিদেশীদের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা 'My Master' প্রভাব বিস্তার করেছে বেশি।

বাংলাতেও পরবর্তীকালে যাঁরাই ঠাকুরের জীবনচরিত রচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই উক্ত গ্রন্থদুটিকে আকর হিসেবে ব্যবহার করেছেন। স্বামী তেজসানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী' প্রকৃতপক্ষে লীলাপ্রসঙ্গের সহজ ও সংক্ষিপ্ত রূপ। সকলের পক্ষে ঐ বিশাল গ্রন্থ পড়া সম্ভব নয় বলেই এ-গ্রন্থ লেখা হয়। মানদাশঙ্কর দাশগুপ্তের 'যুগাবতার রামকৃষ্ণ' পূর্বোক্ত গ্রন্থদুটি অবলম্বনে রচিত একখানি অসামান্য গ্রন্থ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ' জীবনী না হলেও জীবনচরিতের বহু উপাদান সংবলিত একখানি গ্রন্থ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' চমকপ্রদ ও নাটকীয় ভঙ্গিতে লেখা। তবে এ-গ্রন্থের লেখক ইতিহাসকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেননি। আকর্ষণীয় করবার জন্যেই নীরেন্দ্র গুপ্ত কথামৃত থেকে সঙ্কলন করেছেন 'শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মচরিত'।

ঠাকুরের জীবনী রচনার ধারাটি এখনও অব্যাহত রয়েছে। এ-ব্যাপারে লেখক ও পাঠকদের আগ্রহ যত বৃদ্ধি পায় ততই ভাল। যদিও এখন ঠাকুরের জীবনীগ্রন্থগুলি দূর থেকে পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, গৃহী ভক্ত ও সন্ন্যাসীদের রচনায় অনেক পার্থক্য আছে। সংসারীদের ঝোঁক অলৌকিকত্বের প্রতি, সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য আদর্শ জীবনের প্রতি। শুধু তাই নয়, তাঁরা ঠাকুরকে দেখেওছেন দু-ভাবে—সন্ন্যাসী ভক্তরা অন্তরঙ্গভাবে, গৃহীরা বহিরঙ্গরূপে। উভয় ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃত পড়ার পর। তবে একটি ক্ষেত্রে

উভয়েই এক, উভয়ের কাছেই ঠাকুর অহৈতুকী করুণার আধার, কৃপাসিন্ধু। ভক্তির আলোয় লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃত সমান উজ্জ্বল।

জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনীগ্রন্থের একটি পরোক্ষ ভূমিকা আছে। তাঁর জীবনী রচনার ধারাটি অব্যাহত থাকায় পরবর্তীকালে আমরা আরও অন্যান্য বহু সাধকের জীবনের কথা জানতে পেরেছি। এ-জাতীয় গ্রন্থ পাঠের আগ্রহ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অন্য সন্ন্যাসীদের জীবনচরিত রচনা করেও ঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তানেরা বাংলাসাহিত্যের একটি দুর্বল শাখাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছেন। এ-জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজন আজকের সমাজে ও সাহিত্যে খুব বেশি। ধর্মগ্রন্থ বলে এ-সব জীবনীগ্রন্থকে একপাশে সরিয়ে রাখা যায় না। জাতীয় চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের ত্যাগপূত জীবন, নিষ্কাম কর্ম, সত্যনিষ্ঠা ও সেবার মনোভাব আদর্শ হয়ে উঠতে পারে যদি তাঁদের জীবনীগ্রন্থ বৃহত্তর ক্ষেত্রে যথাযথভাবে পরিবেশন করা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাষা

উনিশ শতকে বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ও বিরল ঘটনারূপে চিহ্নিত হতে পারে। এই বীর সন্ন্যাসী শিল্পসৃষ্টির গূঢ় এষণা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি, তবু স্বল্পাবকাশে নিতান্ত প্রয়োজনের যৎসামান্য বাংলা রচনার মাধ্যমে তিনি বাংলাসাহিত্যের জন্য যে অনন্ত সম্ভাবনার সূত্র রেখে গিয়েছেন তার তুলনা হয় না। কথাটি আপাত-অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। বাংলা গদ্য ভাষাকে, বিশেষ করে চলিত ভাষাকে সাহিত্যের সর্বস্তরে প্রয়োগ করে তিনি আধুনিক বাংলাসাহিত্যকে যে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, আজ সে পথটিই বাংলাসাহিত্যের প্রশস্ততম রাজপথে পরিণত হয়েছে। এ পথে তাঁর পূর্বে আর কেউ অকৃত্রিম পৌরুষ ও অসাধারণ বলিষ্ঠতার স্থায়ী চিহ্ন রেখে যেতে পারেননি। অথচ বাংলা ভাষা বা সাহিত্যচর্চা স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল না। একদিকে বেদান্ত-প্রতিপাদিত ধর্মৈষণাকে জড়-জীবনের প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত করে আধুনিক বিশ্ববাসীকে নতুন এবং সার্থক পথ দেখাবার অক্লান্ত চেষ্টা, অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাধিত সমন্বয়বাদী সনাতন হিন্দুধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। সুতরাং বৈদান্তিক অধ্যাত্মচেতনার সমন্বয়সূত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবনধারাকে গ্রন্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী কিভাবে বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তা জানবার আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক। স্বামীজীকে অজস্র বক্তৃতা দিতে হয়েছিল ইংরেজী ভাষায়, প্রচুর লিখতেও হয়েছে ইংরেজীতে। নিয়মিত বাংলা অনুশীলনের পর্যাপ্ত সময় বা সুযোগ তিনি পাননি। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রয়োজনের তাগিদে ও প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লেখার সময় তিনি বাংলা ভাষার চর্চা করেছিলেন। সংখ্যা-গণনায় মাত্র

পাঁচটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ, কয়েকটি কবিতা ও কিছু চিঠিপত্র ছাড়া তাঁর লেখা বাংলায় আর কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু স্বল্প সীমার মধ্যেই স্বামীজীর শৌর্যদীপ্ত ব্যক্তিত্ব মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। তাই নির্দ্বিধায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়, 'স্বামীজীর বাংলা রচনা পরিমাণে স্বল্প হলেও গুণগত উৎকর্ষে তা ঋজু, কঠিন ও সংযত এবং রসোত্তীর্ণতায় বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একটি বিস্ময়।'[১]

বাংলা ভাষা ও স্বামী বিবেকানন্দ

বাংলাসাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার বিগত তিন-চার শতক ধরে (১৬শ শতাব্দী থেকে) দৈনন্দিন কাজকর্ম-ব্যবসা-বাণিজ্য-হিসাব-দলিল-দস্তাবেজ-চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে হলেও উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা গদ্য তার যথার্থ রূপটি খুঁজে পায়নি। গদ্যের একটি নিজস্ব রূপ আছে 'যা মূলতঃ চিন্তাবাহী, যার অন্বয়ের মধ্যে ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে বিরাজ করে।'[২] গদ্যের এই যথার্থ রূপটি ধরা পড়ে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের হাতে। তিনি শুধু বাংলা গদ্যের সহজ শ্রীটিকেই আবিষ্কার করেননি, সেই সঙ্গে চল্‌তি গদ্য ভাষাতেও সাহিত্যসৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন।

অবশ্য বাংলা গদ্যের দুটি রীতি প্রায় প্রথম থেকেই চলে আসছে—একটি সংস্কৃতানুসারী সাধু ভাষা, অন্যটি কথ্যভাষাশ্রয়ী চলিত ভাষা। দুটিতেই সাহিত্যচর্চা শুরু হয় স্বামীজীর জন্মেরও আগে। বিভিন্ন মনীষীর গবেষণা ও অনুশীলনের মধ্যে সাধু ভাষা পরিণত রূপ লাভ করলেও চল্‌তি ভাষা তখনও পূর্ণতা পায়নি। সাহিত্যে চলিত ভাষা কতখানি মৌখিক বা কথ্য-প্রয়োগের অনুসারী হবে এবং কতখানি পরিশীলিত হবে তা নিয়েও বিদ্বৎসমাজে বিতর্কের সীমা ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও বাংলা গদ্যের এই ভাঙা-গড়ার কাজ শেষ হয়নি।

স্বামী বিবেকানন্দ বাংলাসাহিত্যের একটি বাঁধা পথ প্রথম থেকেই পেয়েছিলেন। রামমোহন, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,

বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য রচনা, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা, মধুসূদনের কাব্য ও দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। স্বামীজীর জীবনীকারেরা জানিয়েছেন, শুধু শাস্ত্র ও দর্শন নয়, 'সমসাময়িক নাটক-নভেল-মাসিকপত্র, সংবাদপত্র ও সাময়িক রচনাও তাঁকে আকৃষ্ট করত।'[৩] তাঁর মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথও স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকাবলী ও মাইকেলের কাব্যগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'-র কথা সর্বদা তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত। একটু হাসি-তামাশার কথা হইলেই তিনি সধবার একাদশীর কোনো বোল্ তুলিয়া ঠাট্টা করিতেন। নীলদর্পণ হইতেও মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেন।'[৪]

পরবর্তীকালেও স্বামীজীর রচনায় 'সধবার একাদশীর উদ্ধৃতি চোখে পড়ে, যেমন 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' আছে 'ব্যাতন না জানলে বোদ্র অবোদ্র বুঝবো ক্যামনে ?' অপর একটি বিবরণেও দেখা যাবে, একদিন এক ব্যক্তি বরানগর মঠে এসে দু-চারটি বড় বড় কথা বলায় স্বামীজী "সধবার একাদশী'র বোল্ তুলে ঠাট্টা করতে শুরু করলেন, যেমন, 'ঠিক বলেছিস্—তোর বাপ পড়েছে দাতাকর্ণ তুই পড়বি বোধোদয়।' তাঁর মুখে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় ও রঙ-বেরঙের বোলচাল শুনে অপর সকলেই হেসেছিলেন।'[৫]

বাংলা বইয়ের মধ্যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরও স্বামীজী মন দিয়ে পড়েছিলেন, বহু অংশ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। বিদ্যাসুন্দরের দুর্নৈতিকতার কঠোর সমালোচনা করলেও[৬] ভারতচন্দ্রের কাব্য দীপ্তি, বিশেষ করে তাঁর ভাষা স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল। বস্তুত তাঁর সামনে তৎকালীন বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত দুটি রূপই বর্তমান ছিল। দুটি রূপের সঙ্গেই তাঁর ভাল পরিচয় ছিল। তাঁর রচনায় রাবীন্দ্রিক প্রভাব কিছুমাত্র লক্ষিত না হলেও তিনি যে সমকালীন বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, অপরের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনাতেও বিশেষভাবে উৎসাহিত হতেন তারও নিদর্শন আছে।[৭] বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রূপ ও তার শক্তি সম্বন্ধে যে আগ্রহ ও প্রশ্ন তাঁর

প্রথম জীবনের সাহিত্যপাঠের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, পরবর্তীকালের সাহিত্য-চর্চার মধ্যে তারই প্রকাশ ঘটল। সাধু ও চলিত উভয় ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা থাকলেও স্বামীজী কলকাতার ভাষাকে সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে বাংলাসাহিত্যকে একটি নতুন পথের সন্ধান দিলেন।

বাংলা ভাষার চলিত রূপ

বাংলাসাহিত্যজগতে গদ্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বোধহয় চলিত ভাষা জন্মলাভ করেছিল। বাস্তবিক পক্ষে কোনো লিখিত প্রমাণ না থাকলেও চলিত ভাষাকে সাধু ভাষারও পূর্ববর্তী বলা চলে, কারণ এ ভাষার প্রকৃত স্থান জনসাধারণের মুখে। বাঙালী যখন কাব্য ও পাঁচালী চর্চায় রত ছিল তখনও সে নিশ্চয় কথা বলত এবং সে ভাষা ছিল চলিত বা কথ্য ভাষা। প্রাত্যহিক কথ্য ভাষাই সাহিত্যে চলিত ভাষার রূপ নিয়েছে। চলমান জীবনের বহতা ধারাই তার প্রাণের কেন্দ্রবিন্দু। তাই অনেক সময় দেখা গেছে সাহিত্যিক ভাষারূপে স্থায়িত্বের মর্যাদালাভ করলেই চলিত ভাষার জড়ত্ব আসে এবং মৃত্যু ঘটে। তখন নতুন করে আবার চলিত ভাষার অনুসন্ধান করতে হয়। শোনা গেছে, বৌদ্ধ যুগে পালি ভাষা জনসাধারণের মৌখিক ভাষাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল ; কিন্তু পরবর্তীকালে পালি-কে কেউই নিজের ভাষা বলে গ্রহণ করেনি। একটা কৃত্রিম ভাষারূপেই পালি দূরে রইল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে।

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। প্রথম থেকেই বাংলা চলিত ভাষা অকৃত্রিম প্রাণাবেগে পূর্ণ ছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা গদ্যের রীতি নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার সময় সাধু ভাষার কাঠামোতে চল্‌তি ইতর গ্রাম্য শব্দ ও বাক্যরীতিকেও স্থান দিয়েছিলেন। পরে কয়েকজন মনীষীর রচনার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়ে এ ভাষা বর্তমান রূপ গ্রহণ করেছে।

সচেতনভাবে চলিত ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির কাজে হাত দিয়েছিলেন

প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) ও কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম প্যাঁচা)। সমকালীন জীবনধারার অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা চলিত ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। চলিত ভাষার তীক্ষ্ণ প্রকাশভঙ্গির অসামান্য শক্তি এই দুই লেখকের অজ্ঞাত ছিল না। অবশ্য চলিত ভাষায় না লিখলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর বেনামী রচনায় যে-সব তীক্ষ্ণ অথচ লঘু ও কৌতুকপূর্ণ বাক্যরীতি ব্যবহার করেছিলেন সেগুলির কথাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তীক্ষ্ণতার সঙ্গে চলিত ভাষার অপর বৈশিষ্ট্য ঋজুতা বা সারল্য।

প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সরল স্ত্রীপাঠ্য বাংলা ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির জন্যই 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এর মাধ্যম ছিল চলিত ভাষা। উনিশ শতকের মনীষীবৃন্দ ধরে নিয়েছিলেন চলিত ভাষা প্রকৃতপক্ষে নারীদের মুখের ভাষা, এই ভাষা তাদের পক্ষে বোঝা সহজ। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এও প্যারীচাঁদ একেবারে মৌখিক চলিত ভাষা ব্যবহার না করে সাধু ভাষার সঙ্গে কলকাতার চল্‌তি বুলি মিশিয়ে উপন্যাসটি রচনা করেন। এদিক থেকে তাঁকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের উত্তরসূরি বলা যায়। বিষয়টি উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট করা যাক। আমরা হানা ক্যাথারিন্স ম্যালেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', লালবিহারী দে-র 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' কিংবা উইলিয়াম কেরীর গদ্য রচনাগুলিকে এ প্রসঙ্গ থেকে বাদ দিচ্ছি, কারণ এরা মূল বিষয়ে পৌঁছতে বিশেষ সাহায্য করে না।

মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার উদাহরণ—'কেমন এখন হইল। যেমন মতি তেমনি গতি। ভাতারের গরবে ভুঁয়ে পা পড়ে না। তোর স্বামী বুঝি আমার ঘাড় ভাঙ্গিবে? আয় দেখসিয়া, কার ঘাড় ভাঙ্গা গেল।' (প্রবোধ চন্দ্রিকা)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনায় সাধু ভাষা ব্যবহৃত হলেও তাতে চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য মিশে আছে—'শুনিতে পাই, আমার এই ক্ষুদ্র মহাকাব্যখানি অনেকের পছন্দসই জিনিস হইয়াছে। ফাজিল

চালাকেরা রটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা বিদ্যাসাগরের লিখিত। যাঁহারা সেরূপ বলেন, তাঁহারা যে নিরবচ্ছিন্ন আনাড়ি, তাহা এক কথায় সাব্যস্ত করিয়া দিতেছি।···যেরূপ শুনিতে পাই তাহাতে তিনি 'না বিইয়া কানাইয়ের মা' হইতে চাহিবেন সে ধরনের জন্তু নহেন।'

প্যারীচাঁদ লিখছেন—'বাঞ্ছারামবাবু তেড়ে আসিয়া বলিলেন, গোলমাল করিয়া শ্রাদ্ধ ভণ্ডুল করিলে পরে বুঝব—একেবারে বড় আদালতে এক শমন আনব—এ কী ছেলের হাতের পিটে ? —বক্রেশ্বর বলেন তা বইকি আর যিনি শ্রাদ্ধ করিবেন তিনি তো সামান্য ছেলে নন, তিনি পরেশ পাথর।···অবশেষে সভার ভদ্রলোক সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া কহিতে লাগিল, "কার শ্রাদ্ধ কে করে খোলা কেটে বামুন মরে" এই বেলা সরে পড়া শ্রেয়—ছবড়ি ফেলে অমিত্তি কেন হারান যাবে ?' (আলালের ঘরের দুলাল)

এ-সব ক্ষেত্রে সাধু ও চলিতের অবাধ মিশ্রণে ভাষা অনেক সহজ-বোধ্য হয়েছে। আধুনিক বিচারে এই ধরনের বাক্যবিন্যাস গুরুচণ্ডালী-দুষ্ট এবং স্পষ্টতই শ্রুতিকটু। কিন্তু প্রাক-রবীন্দ্র পর্বে কেউই এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। এমনকি নাট্যকারেরাও নয়! সম্ভবত ভাষার তীক্ষ্ণতার প্রতিই তাঁদের দৃষ্টি পড়েছিল বেশি। স্বামীজীর অনেক রচনায় এই মিশ্রণ চোখে পড়ে, তবে সে রীতি স্বতন্ত্র, কখন কিছুটা ইচ্ছাকৃত, কোথাও বা অন্যমনস্কতাবশত।[৮]

কলকাতার মৌখিক ভাষা যাবতীয় বিকৃতিসহ প্রথম সাহিত্যে স্থান পেল কালীপ্রসন্ন সিংহের হাতে। হুতোম প্যাঁচা ছদ্মনামে তিনি সে-যুগের কলকাতাকে তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। চাবুক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন কলকাতার চল্‌তি বুলিকে, 'তিনি যেন পণ করেছিলেন, মুখের কথা যা জিভ দিয়ে উচ্চারিত হয়, তা ভালো-মন্দ, শ্লীল-অশ্লীল, গ্রাম্য-নাগরিক—যাই হোক না কেন তিনি ব্যবহার করবেন।'[৯] সাহিত্যে মৌখিক ভাষার প্রয়োগ কষ্টকর, হুতোম সেই কষ্টসাধ্য কাজই করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সে-যুগের

তুলনায় আশ্চর্য সচেতনতা নিয়ে তিনি এই নকশা রচনা করেছিলেন—কোথাও সাধু-চলিতের মিশ্রণ ঘটেনি।

জনমানসে 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' আলোড়ন জাগিয়েছিল প্রধানত ভাষার গুণে। বহুদিন ধরে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র অনুকরণে বেশ কিছু নকশা লেখা হয়। সবারই ভাষা হুতোমের মতো কলকাতার মৌখিক ভাষা। কিন্তু সাহিত্যজগতে প্রতিনিধিমূলক ভাষারূপে এদের ভূমিকা খুব বেশি নয়। মধুসূদন 'আলালী ভাষা' এবং বঙ্কিমচন্দ্র 'হুতোমী ভাষা'য় কোনো সৌন্দর্য খুঁজে পাননি। নবসৃষ্ট এই ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

আলালী ভাষা ও হুতোমী ভাষা ক্রমে সমাদর লাভ করতে থাকে নাটক ও প্রহসনের সংলাপের মধ্যে। সংলাপই নাটকের প্রাণ; সংলাপের ভাষায় চল্‌তি বাগভঙ্গি না থাকলে মুখের ভাষাই প্রাধান্য পায়। এমনকি যে মধুসূদন আলালী ভাষাকে 'The language of fisherman' বলেছিলেন তিনিও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন দুখানি রচনার সময় আলালী ভাষাকেই গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের সুললিত ও সংস্কৃত-অনুসারী তৎসম শব্দপ্রধান ভাষার পাশে পাশে এভাবে চলিত ভাষাও একটি স্থান অধিকার করল। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় Calcutta Review পত্রিকায় চলিত ভাষার পক্ষে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি বৈয়াকরণ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সর্ব-কর্মে তৎসম শব্দের পরিবর্তে তদ্ভব বা দেশজ শব্দের ব্যবহার অনুমোদন করেছিলেন।[১০] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তৎসম শব্দের প্রতি অযৌক্তিক বীতরাগ সমর্থন করেননি। সরল ভাষার পক্ষপাতী হলেও তাঁর মতে, 'যিনি যত বলুন, লিখনের ভাষা ও কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে।'[১১] তবু মৌখিক ভাষা বাংলাসাহিত্যের আসরে প্রাণাবেগপূর্ণ সার্বজনীন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হল আরও কিছুদিন পরে।

কলকাতার ভাষার বৈশিষ্ট্য

কলকাতার ভাষা কোনো স্বতন্ত্র ভাষা নয়, কলকাতা অঞ্চলের অধিবাসীদের মৌখিক ভাষাকেই কলকাতার ভাষা বলা হয়, চলিত ভাষার সঙ্গে এর পার্থক্য সামান্যই। সাহিত্যের ভাষা বা লেখ্য ভাষার একটা বাঁধা রীতি থাকে, মুখের ভাষায় তা থাকে না। তাতে মিশে থাকে আরও অনেক কিছু। যেমন স্থানীয় উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিগত উচ্চারণবিকৃতি বা কোনো শব্দের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক, দ্রুত উচ্চারণের সুবিধের জন্যে কোথাও স্বেচ্ছাকৃত সন্ধি বা অতিরিক্ত স্বরবর্ণ যোগ প্রভৃতি। তাই অঞ্চলভেদে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা গড়ে ওঠে। পুরুলিয়া থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত লেখ্য বাংলা ভাষার নিয়ম এক হলেও কথ্য ভাষার মধ্যে কোনই সাদৃশ্য নেই। একজন মেদিনীপুরবাসীর কাছে চট্টগ্রামের ভাষা চীনা ভাষার মতোই দুর্বোধ্য, চট্টগ্রামের লোকের কাছেও মেদিনীপুরের ভাষা তথৈবচ। সুতরাং একেবারে মৌখিক ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি কিছুটা অসুবিধাজনক। লণ্ডনের কথিত উপভাষাও একই কারণে ইংরেজ লেখকরা গ্রহণ করেননি। কলকাতার কক্‌নির মতো সেখানেও উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন, হাসিফ্ (house-wife), টুপনী (two penny), টুয়েভ (two have) ইত্যাদি লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। কলকাতারও এরকম নিজস্ব কিছু উচ্চারণ আছে। সাধারণত আমরা চলিত ভাষা বলতে বুঝি সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের লঘু প্রয়োগ। অর্থাৎ সর্বনাম ও ক্রিয়াপদকে একটু ছেঁটে-কেটে, ছোটখাটো করলেই তা চলিত ভাষায় পরিণত হয়। যেমন 'তাঁহাদের' পরিবর্তে 'তাঁদের', 'তাহার' পরিবর্তে 'তার', 'বলিলেন'-এর পরিবর্তে 'বললেন', 'যাইব'-র পরিবর্তে 'যাব', 'শুইয়াছিল'-র পরিবর্তে 'শুয়েছিল', 'যাইতেছি'র পরিবর্তে 'যাচ্ছি', 'খাইতেছি'-র পরিবর্তে 'খাচ্ছি', 'গিয়াছিলাম'-এর পরিবর্তে 'গেছিলাম' ইত্যাদি। আসলে কিন্তু তা নয়। চলিত ভাষায় চল্‌তি জীবনের বাগবৈশিষ্ট্য, শব্দ, বাক্য, এমনকি বক্তার প্রকাশভঙ্গি পর্যন্ত তার সবটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠলে তাকে সার্থক চলিত ভাষা বলা যায়। কোনো কোনো প্রবাদে

এই বৈশিষ্ট্য আছে,

'বাছার আমার কিবা রূপ—
ঘুঁটের ছাইয়ের নৈবিদ্যি খেংরা কাটির ধূপ।'

কিংবা,

'যার জন্যে করলুম যো
সেই বলে পৈথানে শো।'

কিংবা,

'খাবার ব্যালায় সবার মা,
উলু দেবার ব্যালায় ব্যাতে ঘা।'

এইসব মেয়েলি প্রবাদে বক্তার ভাবভঙ্গি, ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠস্বর, ইঙ্গিতময় কটাক্ষ যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং নিহিতার্থের তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধেও সন্দেহ থাকে না। চলিত ভাষায় এই লক্ষণটিই হচ্ছে প্রাণের লক্ষণ। এই চলিত ভাষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে আঞ্চলিক ভাষা এবং বাচনভঙ্গি। সে ভাষা সকলের পক্ষে সহজবোধ্য নয়, হতেও পারে না। 'আমের রস' যে স্থানবিশেষে কোনো অঞ্চলের মুখের ভাষায় 'রামের অস' হবে সে-কথা সবাই বুঝবে কি করে? শেষে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হয় কলকাতার ভাষাকে চলিত ভাষা রূপে গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল, কলকাতার নিজস্ব ভাষা বলতে যা ছিল, এখন আর কিছু নেই। 'সুতানুটি-গোবিন্দপুরের আমলে যে ভাষা লোকে বলত তা অনেকটা আজকের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গ্রামাঞ্চলের ভাষার মতো বলে অনুমান করা যায়।'[১২] কলকাতার আদি নিবাসীদের ভাষা কি ছিল একবার পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁর মতে, 'কলিকাতার কোন বিশিষ্ট প্রাদেশিকতা নাই। খাচ্চি, যাচ্চি, নিচ্চি, গেলুম, খেলুম ইহা কলিকাতার ভাষা নহে। যাহারা কলিকাতার আদি নিবাসী অর্থাৎ তিলি, তাম্বুলী, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ী জাতি তাহাদের এ ভাষা নহে। ইহা ত্রিবেণী ও আন্দুল-মৌরীর ভাষার খিচুড়ী মাত্র। এ ভাষা বা প্রাদেশিকতা, প্রাদেশিকতা নহে, বরং উহাকে সাম্প্রদায়িক ভাষা বলিতে পারি। কেননা উহা

বিলাত-ফেরতা বাবুদের ভাষা এবং পিরালী বাবুদের ভাষা। উহাতে যশোরের আমেজ আছে, দক্ষিণ জয়নগর-মজিলপুরের ঢং আছে। আর পিরালী বাড়ির ভঙ্গীও আছে। এমন 'জগাখিচুড়ী' চলে না।'[১৩] অন্যত্রও তিনি এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। যেমন, 'ছোকরার দলে একটা 'সবুজসঙ্ঘ' হইয়াছে, তাহারা বাঙ্গালা গদ্যকে কলকাত্তাই ঢঙে ঢালিতে চেষ্টা করিতেছে…ইহা টিকিবে না, টিকিতে পারিবে না, কেন না, ইহা বাঙ্গালীর ধাতুর অনুকূল ও অনুগামী নহে।'[১৪] কিংবা, 'কেহ বা রবিয়ানা মক্স করেন, কেহ বা হচ্ছে, খাচ্ছে, খেলুম-নিলুম-হালুম চালাইয়া গদ্য লেখেন। খাস কলিকাতার ভাষা পত্রস্থ করেন।'[১৫] রবীন্দ্র বিরোধিতায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন আচ্ছন্ন হয়ে না থাকলে তিনি অনুসন্ধান করলে দেখতে পেতেন সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে কলকাতার ভাষাকে ব্যবহার করার কথা রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর অনেক আগে বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, কোনো প্রাদেশিকতা যাঁকে কোনদিন স্পর্শ করেনি। তাছাড়া, শুধু তিলি, তাম্বুলী, তন্তুবায় কেন, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন কর্মে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষার অনুশীলন কোনদিন কোনো বিদ্বৎসমাজ করে না, রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী করেননি, স্বামীজীও না—কলকাতার ভাষার সহজবোধ্যতা ও সজীবতাই তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল।

অষ্টাদশ শতক থেকেই নানা কারণে কলকাতা শহর গুরুত্বলাভ করতে থাকে। আদিতে কলকাতা সুতানুটি-গোবিন্দপুর সংলগ্ন তিনখানি গ্রামের একটি হলেও পরবর্তীকালে কলকাতা বৃহত্তম মহানগরীতে পরিণত হয়েছে। বলা বাহুল্য বাণিজ্যিক ও অন্যান্য নানা কারণে কলকাতা অন্যান্য নগর অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করে এবং সেখানে নানাদেশের নানাবর্ণের জনসমাগম হতে থাকে। ইংরেজরা যখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে তখন শাসনবিভাগ পুনর্গঠিত হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। এদেশের যে-সব ব্যক্তি সরকারী পদ লাভ করেন তাঁরাও দূর-দূরান্ত থেকে এসে কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করলেন। তার ফলে কলকাতা অল্প

কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বাসস্থান হয়ে ওঠে।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন তখনকার কলকাতাকে বর্তমানে 'উত্তর কলকাতা' বলা হয়। উত্তর কলকাতার মিউনিসিপ্যাল বিভাগীয় ছয়-এর পল্লী বাংলার বহু মনীষীর আবাসস্থল এবং নতুন কৃষ্টির বিবর্তনে 'বাংলার এথেন্স নগরী'-রূপে পরিচিত হয়েছিল।[১৬] এ-সময় থেকেই কলকাতার ভাষা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর একটি যথার্থ ছবি এঁকেছেন, 'উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতাকে কেন্দ্র করে একটা নাগরিক বৈশ্য সভ্যতার পত্তন হল, বিভিন্ন অঞ্চলের বিদগ্ধ ও উচ্চাশী জনমণ্ডলী—যাঁরা কলকাতা বা তার চারপাশে ঘোরাফেরা করতেন নানা স্বার্থসন্ধানে, তাঁদের দ্বারা কলকাতার ভদ্রজনের কথিত ভাষা আভিজাত্যকামী সম্পন্ন গ্রামীণ পরিবারে অল্পবিস্তর প্রবেশ করেছিল।...উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সাহিত্যে সঙ্কুচিতভাবে কলকাতার চলিত ভাষার সাধ্বস-প্রবেশ ঘটল।'[১৭] সুতরাং দীর্ঘকাল ধরে সাধু ভাষা সমগ্র বাঙালী মানসকে যেভাবে একসূত্রে বেঁধে রেখেছিল, কলকাতার মুখের ভাষাও সেই যোগসূত্র স্থাপনে সক্ষম হল। অন্য কোনো উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার পক্ষে যা কখনই সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার মিশ্রণে কলকাতার ভাবারও পরিবর্তন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, প্রথমে 'সাথে' শব্দটা পূর্ববঙ্গীয় সংলাপে শোনা যেত, কলকাতা অঞ্চলে বলা হত 'সঙ্গে'। 'কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কানে যেমনি লাগুক 'সঙ্গে' কথাটা 'সাথে'র কাছে হার মেনে আসছে।'[১৮]

আর-একটা ঘটনার কথা শুনিয়েছেন স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি লিখেছেন, 'দাদা ও আমি তখন বালক। বাহিরের দালানে তক্তাপোশে আমরা আছি। একটি বৃদ্ধ লোক তাহার চটিজুতাটি রাখিয়া বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিল। আমি সাধারণভাবে বলিলাম, 'মশাই, আপনার জুতো ফেলে গেছেন।' দাদা আমায় এক চড় মেরে বলিল, 'বৃদ্ধ লোকের সম্মান রেখে কথা কহিতে হয়।' আমি মারের ভয়ে দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করিলাম, 'মঁশাঁই আঁপঁনাঁর জুঁতোঁ ফেঁলেঁ গেঁছেন।...এখন ইহা হাস্য কৌতুকের কথা, কিন্তু পূর্বে ইহার প্রচলন

ছিল ; এবং "ঁ" দেওয়া বা আনুনাসিক শব্দ দেওয়া সমানসূচক হইত।'[১৯] পূর্ববঙ্গে চন্দবিন্দুর উচ্চারণ নেই বললেই চলে। এখনকার কলকাতার ভাষাতেও চন্দবিন্দু লোপ পেতে বসেছে ঐ একই কারণে, অর্থাৎ কানে যেমনি লাগুক 'ওঁকে' কথাটা 'ওনাকে'র কাছে হার মেনে আসছে। শুধু পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা নয়, কলকাতার ভাষার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে বিভিন্ন প্রদেশের ভাষার। প্রথমদিকে অর্থাৎ ইংরেজী ভাষা প্রচলনের আগে কলকাতায় ফারসী ভাষার বহুল প্রচলন দেখা যেত। আইন-আদালতের ভাষা ছিল ফারসী। ত্বু' পয়সা উপার্জনের আশায় সকলেই চেষ্টা করত আরবী-ফারসী শিখতে। বাংলার সঙ্গে ফারসী মিশিয়ে কথা বলাই ছিল ভদ্রতার লক্ষণ। 'মোকাবিলা করে নাও', 'গুপ্তগু করে নাও', 'সে খুব কামেল আছে' স্বামী বিবেকানন্দের শৈশবে কলকাতার ভদ্রভাষারূপে এগুলি পরিচিত ছিল। শাসক সম্প্রদায়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ফারসী ভাষার প্রভাব কমতে শুরু করলেও কলকাতার ভাষায় ফারসী ভাষাও কিছুটা ছাপ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এভাবেই কলকাতার ভাষা সার্বজনীনতা লাভ করেছে। যে কোনো ভাষাকে কিংবা যে কোনো ভাষার শব্দকে আত্মসাৎ করে নেবার অসাধারণ ক্ষমতাই কলকাতার ভাষাকে অপরাজেয় করে তোলে।

উনবিংশ শতকের বাঙালী মনীষীরাও কলকাতার ভাষার প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ এই ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিটিকে আবিষ্কার করলেন এবং সাহিত্যে প্রয়োগ করে বাংলাসাহিত্যের পরিধি অনেকখানি প্রসারিত করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অসাধারণ ধীশক্তির দ্বারা সহজেই কলকাতার ভাষার বৈশিষ্ট্যটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম তিনিই এই ভাষাকে সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন, 'বাংলা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে সেইটিই নিতে হবে অর্থাৎ কলকেতার ভাষা।'[২০] সংশয়হীন দৃঢ়তা নিয়ে তিনি আরও জানালেন, 'পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়।

তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে,. যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে, এবং চট্টগ্রাম থেকে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত কলকেতার ভাষাই চলবে।'[২১] যুক্তি দিয়ে স্বামীজী আরও বললেন, 'কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশি নিকট, সেকথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে।'[২২]

স্বামীজীর উক্তি আজ প্রায় অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বিশ শতকের গোড়ায় (১৯০১) তিনি যে অভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করেছিলেন সে-কথা বোঝা যায় আরও দশ-বারো বছর পরে, যেদিন প্রমথ চৌধুরী বললেন, 'আজকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সকল প্রদেশেরই বাঙালী ভদ্রলোকের মুখের ভাষা প্রায় একই রকম হয়ে এসেছে। প্রভেদ যা আছে সে শুধু টানটুনের। লিখিত ভাষার রূপ যেমন কথিত ভাষার অনুকরণ করে, তেমনি শিক্ষিত লোকদের মুখের ভাষাও লিখিত ভাষার অনুসরণ করে। এই কারণেই দক্ষিণদেশী ভাষা, যা কালক্রমে সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছে, নিজ প্রভাবে শিক্ষিত সমাজেরও মুখের ভাষার ঐক্যসাধন করছে।...আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে কলকাতার মুখের ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠবে।'[২৩]

প্রমথ চৌধুরী এই মন্তব্য করেন ১৯১২ সালে। রবীন্দ্রনাথও কলকাতার ভাষার সার্বজনীন আবেদন উপেক্ষা করতে পারেননি। বরং এর যৌক্তিকতা বিচার করে বলেছিলেন, 'সমস্ত বাংলাদেশের একমাত্র রাজধানী থাকাতে সেইখানে সমস্ত বাংলাদেশের একটি সাধারণ ভাষা আপনি জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহা ফরমাশে গড়া কৃত্রিম ভাষা নহে, তাহা জীবনের সংঘাতে প্রাণলাভ করিয়া সেই প্রাণের নিয়মেই

বাড়িতেছে।···সংস্কৃত বাংলা আপনার খোলস ভাঙিয়া যে ছাঁদে ক্রমশঃ প্রাকৃত বাংলার রূপ ধরিয়া উঠিতেছে সে ছাঁদ ঢাকা বা বীরভূমের নয়। তার কারণ নানা প্রদেশের বাঙালী শিখিতে, আয় করিতে, ব্যয় করিতে, আমোদ করিতে, কাজ করিতে অনেককাল হইতেই কলিকাতা আসিয়া জমা হইতেছে। তাহাদের সকলের সম্মিলনে যে এক ভাষা গড়িয়া উঠিল তাহা ধীরে ধীরে বাংলার সমস্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে।'[২৪] ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ এ-কথা বলেছিলেন।

প্রায় একই কথা বললেন রাজশেখর বসু, ১৯৩৩ সালে। তিনি ভাষাকে তুভাগে ভাগ করার পক্ষপাতী ছিলেন—মৌখিক ও লৈখিক। অর্থাৎ মুখের ভাষা যেমনই হোক সর্বাঞ্চলবোধ্য সাহিত্যের উপযুক্ত একটি ভাষা থাকা অত্যাবশ্যক। সেই লৈখিক ভাষাটি গড়ে উঠবে একটি মৌখিক ভাষাকে আশ্রয় করেই। 'কোনও এক অঞ্চলের মৌখিক ভাষার প্রকার আশ্রয় করেই লৈখিক ভাষা গড়তে হবে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক ভাষারই যোগ্যতা বেশি, কারণ, এ ভাষার পীঠস্থান কলকাতা সকল সাহিত্যিকের মিলনক্ষেত্র, রাজধানীও বটে।'[২৫]

আরও কয়েক বছর পরে ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন কণ্ঠে রায় দিলেন, 'যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুখে এবং সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই আসন ছেড়ে দিয়ে সাধু ভাষা ঐতিহাসিক কবরস্থানে বিশ্রাম লাভ করবে।'[২৬] এই দক্ষিণী বাংলা যে বিশেষভাবে কলকাতা অঞ্চলের ভাষা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে কবি সে-কথা জানাতেও দ্বিধা করেননি। অথচ অনেকেই মনে করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী তুজনেরই 'চলিত ভাষার উৎস সাধু ভাষা-অর্থাৎ সাধু ভাষারই একটা কৃত্রিম কথ্যরূপ তাঁরা তৈরি করবার চেষ্টা করেছিলেন চলিত ভাষা নামে।'[২৭] তাই কালীপ্রসন্ন ও স্বামীজীর চলিত ভাষা, যা কলকাতা অঞ্চলের কথ্য ভাষার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে স্বতন্ত্র।[২৮] অর্থাৎ বাংলা চলিত ভাষার উৎস তুটি। একটি কলকাতা অঞ্চলের কথ্য ভাষা, অপরটি কৃত্রিম কথ্য ভাষা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন, 'তর্ক ওঠে, বাংলা-দেশে কোন্ প্রদেশের ভাষাকে সাহিত্যিক কথ্য ভাষা বলে মেনে নেব।

উত্তর এই যে, কোনো বিশেষ কারণে বিশেষ প্রদেশের ভাষা স্বতই সার্বজনীনতার মর্যাদা পায়। যে সকল সৌভাগ্যবান দেশে কোনো একমাত্র ভাষা বিনা তর্কে সর্বদেশের বাণীরূপে স্বীকৃত হয়েছে, সেখানেও নানা প্রাদেশিক উপভাষা আছে। বিশেষ কারণে টস্‌কানি প্রদেশের উপভাষা সমস্ত ইটালির এক ভাষা বলে গণ্য হয়েছে। তেমনি কলকাতা শহরের নিকটবর্তী চারদিকের ভাষা স্বভাবতই বাংলাদেশের সকলদেশী ভাষা বলে গণ্য হয়েছে। এই এক ভাষার সার্বজনীনতা বাংলাদেশের কল্যাণের বিষয় বলেই মনে করা উচিত।'[২৯] অন্য একটি পত্রেও কবি মন্তব্য করেছেন, 'কলকাতার ভাষা কোনো বিশেষ জেলার নয়—সব জেলার লোক এক জায়গায় এসে এ ভাষা তৈরি করেছে—তাই সহজেই কলকাতার ভাষা সাহিত্যের ভাষা হতে পেরেছে।'[৩০]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কলকাতার ভাষার সার্বজনীনতার প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও রাজশেখর বসুর দৃষ্টি পড়েছিল। তাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে কলকাতার ভাষাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু স্বামীজীর মতো বলতে পারেননি, 'স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না ; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ঘোরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরি ভাষা কোনও কালে হবে না।'[৩১] বরং তাঁরা চেয়েছিলেন কিছুটা পরিশীলিত কলকাতার ভাষাকে, যার অঙ্গে কোনো আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বা শহুরে 'ককনি ভাষার ছাপ নেই। খাস কলকাতার ভাষার অশালীন ও বিকৃত উচ্চারণ তাঁরা বর্জন করতেই চেয়েছিলেন।

রাজশেখর বসুর মতে, 'যদি পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক ভাষার উচ্চারণের উপর অতিমাত্র পক্ষপাত করা হয় তবে উদ্যম পণ্ড হবে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও বানান আর উচ্চারণের সঙ্গতি সর্বত্র বজায় রাখা সম্ভবপর নয়।'[৩২]

উচ্চারণের ওপর বেশি ঝোঁক দিলে যে অসুবিধে সৃষ্টি হতে পারে তার উল্লেখ করে রাজশেখর বসু দেখিয়েছেন, কলকাতার লোক যখন বলে 'রমণীর মোন' তখন বরিশালবাসী বলে 'রোমোণীর মঅন'—ছাপার হরফে দুটি উচ্চারণই গ্রহণের অযোগ্য।[৩৩] সেজন্যে তিনি মনে করেন, 'লৈখিক বা সাহিত্যের ভাষার রূপ ও প্রকার সংযত নিরূপিত ও সহজে অধিগম্য হওয়া আবশ্যক, নতুবা তা সার্বজনীন হয় না, শিক্ষারও বাধা হয়। সুতরাং একটু রক্ষা ও কৃত্রিমতা—অর্থাৎ সকল মৌখিক ভাষা হতে অল্পাধিক প্রভেদ—অনিবার্য।'[৩৪] এর কয়েক বছর আগে বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য 'সবুজপত্রে'র চলিত ভাষার প্রতিবাদ করবার সময়ও সাধু ভাষায় 'চল্‌তি বুকনি' প্রয়োগের কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'যেসব সাধারণ সহজ শব্দ সর্ব প্রদেশেই আছে, তাহাই গ্রহণ করা কর্তব্য। যথা, হুবহু, আগাগোড়া, নজরবন্দী, দাবি, মনগড়া, ঝালঝাড়া ইত্যাদি কথা কলিকাতাতেও আছে, ঢাকাতেও আছে আবার রংপুরেও আছে।'[৩৫] অর্থাৎ তিনি সাধু ভাষার সমর্থক হয়েও সাহিত্যে চল্‌তি শব্দের প্রয়োগ চেয়েছিলেন এবং সেই চল্‌তি শব্দগুলি যাতে সার্বজনীন হয় সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। স্বামীজী বলেছিলেন কলকাতার ভাষাই সার্বজনীন হয়ে উঠছে। জোর করে তিনি বিকৃত উচ্চারণকে কলকাতার ভাষা বলে গ্রহণ করতে চাননি, অশালীন শব্দও না। তবে কোনরকম কৃত্রিমতায় তাঁর আপত্তি ছিল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যকে লেখার ভাষায় রাখতে চেয়েছিলেন ভাবকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে। যেমন, 'হাত চুবড়ে সপাসপ ডালভাত খাই' কিংবা 'এ ছুঁৎছাতের ন্যাটার কাছে আমাদের দিশী ছুঁৎছাৎ কোথায় লাগে'। এখানে 'চুবড়ে' ও 'ন্যাটা' শব্দ ভাবপ্রকাশে সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশি। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' লেখার সময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ভাবপ্রকাশের জন্য শব্দ বাছাইকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, 'রামপ্রসাদ বলেছেন: আমি করি দুখের বড়াই। "বড়াই" বর্গের অনেক ভারী ভারী কথা ছিল: গর্ব করি, গৌরব করি, মাহাত্ম্য বোধ করি। কিন্তু দুঃখকেই বড়ো করে নিয়েছি বলবার জন্যে, অমন নিতান্ত সহজ অর্থাৎ ঠিক কথাটি

বাংলা ভাষায় নেই।'[৩৬] এই নিতান্ত সহজ অথচ শক্তিশালী শব্দসন্ধানের জন্যই স্বামীজী কলকাতার ভাষার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাঁর আগে জীবনের সবরকম অনুভূতিকেই চল্‌তি ভাষায় প্রকাশ করার কথা কেউ ভাবেননি।[৩৭] জীবনের সর্বস্তরে 'কলকাতার ভাষা' ব্যবহার করবার নির্দেশ দিয়ে স্বামীজী বাংলাসাহিত্যকে অত্যন্ত যুগোপযোগী পথের সন্ধান দিলেন।

উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্যে কলকাতার ভাষা

কলকাতার চল্‌তি ভাষায় সাহিত্যচর্চার চেষ্টা স্বামীজীর আবির্ভাবেরও আগে শুরু হয়েছে। স্বামীজী যখন 'উদ্বোধনে'র জন্য বাংলায় প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন তার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেই 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' লেখা হয়। তবুও স্বামীজী এই ভাষায় এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছিলেন যা পূর্বে ছিল না। এই বিষয়টি পরিস্ফুট করার জন্য স্বামীজীর পূর্ববর্তী ও সমকালীন লেখক-বৃন্দের রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। কলকাতাবাসীর মৌখিক ভাষা সার্বজনীনতা লাভ করলেও এই ভাষায় অপর প্রদেশের ভাষার অবাধ মিশ্রণ যেমন ঘটেছে তেমনি কিছু বিকৃতিও স্থান পেয়েছে। কেউ কেউ বিকৃতিগুলি সযত্নে বর্জন করতে চান। বিকৃতি সর্বদাই বর্জনীয়, সেজন্যে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু স্বামীজী অশ্লীল ও শ্রুতিকটু শব্দ বর্জন করলেও সর্বত্র কলকাতার ভাষাবৈশিষ্ট্যকে বর্জন করেননি, বরং ভাবপ্রকাশের সহায়করূপে গ্রহণ করেছিলেন—একথা আগেই বলেছি। কলকাতার মৌখিক ঢঙ যেমন, কলকাতা>কলকেতা; আম>আঁব, বিয়ে>বে, লিচু>নিচু এ-সবও তাঁর লেখায় অবাধ প্রবেশাধিকার পেয়েছে।

প্রধানত ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করার জন্যই প্রথম যুগের লেখকেরা কলকাতার ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র সহজবোধ্যতার জন্যেই চলিত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি সাধু-চলিত ও আঞ্চলিক ভাষা মিশিয়ে একটি মিশ্র ভাষা তৈরি করেছিলেন

এবং তাঁর মতে সেটিই ছিল ভবিষ্যতের আদর্শ ভাষা। 'আমার প্রবর্তিত এই রচনাপদ্ধতিই বাঙ্গালা ভাষায় নির্বিবাদে প্রচলিত এবং চিরস্থায়ী হইবে।'[৩৮] প্রথম প্রকাশের পরে 'আলালের ঘরের দুলাল' জনচিত্তে সাড়া জাগাতে পেরেছিল।

'আর বামুন, তুই যদি হ য ব র ল শিখাইতে আমার নিকট আর আস্‌বি ঠাকুর ফেলিয়া দিয়া তোর চাউল কলা পাইবার উপায়সুদ্ধ ঘুচাইয়া দিব। কিন্তু বাবার কাছে গিয়া এ কথা বল্লে ছাতের উপর হতে তোর মাথায় এমন এক এগারঞ্চি ঝাড়িব যে তোর ব্রাহ্মণীকে কালই হাতের নোয়া খুলিতে হইবে।'[৩৯] এখানে চলিত ভাষা প্রাধান্য পেলেও ক্রিয়াপদগুলোতে সাধু প্রয়োগই বেশি। যেমন—শিখাইতে, ফেলিয়া দিয়া, ঘুচাইয়া দিব, ঝাড়িব, খুলিতে হইবে প্রভৃতির সঙ্গে 'বল্লে', 'ভাবছিস', 'এগারঞ্চি', 'নোয়া' শব্দ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আলালী ভাষা পুরোপুরি চলিত কিংবা কলকাতার ভাষা হয়ে ওঠেনি, তবে কলকাতার ভাষা থেকে তিনি বহু শব্দ ও বাগবৈশিষ্ট্য সংগ্রহ করেছিলেন।

১৮৫৮ সালে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশের পরে সময়ের দিক থেকে এর পরেই লেখা হয় মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। আলালী ভাষা মধুসূদনের ভাল না লাগলেও প্রহসন রচনার সময় তিনি ঐ ভাষার শক্তিকে অস্বীকার করেননি। কারণ শাণিত ব্যঙ্গে সমাজকে কশাঘাত করতে হলে জীবন্ত ভাষার সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। মুখের ভাষার জোরালো ভাবকে তিনি প্রহসনের মধ্যে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করলেন—

'আঃ কি উৎপাত! এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল। কোথাই বা সভা আর কোথাই বা কী? লাভের মধ্যে কেবল আমারি যন্ত্রণা সার। যদি আবার ফিরে যাই তাহলে কর্তাটি আবার রাগ করবেন। আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেম। এখন করি কি? হেঁ ভাল হয়েচে, এই একটা মুস্কিল আসান আসবে, ওর পিছনে আলোয় আলোয় এই বেলা

প্রস্তাব করি।'[৪০] এ ভাষা আলালী ভাষা থেকে খুব পৃথক নয়, বরং সমগোত্রীয়। সুতরাং মাইকেল নাটকের ক্ষেত্রে যে আলালী ভাষা বা কলকাতার চলিত ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর লেখাতেও 'দেক্‌তো লা', 'খুঁজবো গা', 'রোঁদ ফিরতে বেরয়েচে', 'কলকেতায়', 'দেখিইচো', 'ঘুমুচ্চিস', 'মুড়ো খ্যাংরা দে বিষ ঝাড়বো' প্রভৃতি শব্দের অজস্র প্রয়োগ চোখে পড়ে, যা একান্তভাবে কলকাতার আদিভাষারূপেই পরিচিত।

পরবর্তীকালে বহুদিন পর্যন্ত বাংলা নাটকে এই জাতীয় মিশ্র ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। অনেকেই মনে করতেন, 'নাটকে যখন যে জেলার ও যে শ্রেণীর লোক কথা কহিবে, সেই ব্যক্তির নিজ স্থানীয় ভাষানুযায়ী কথা স্থাপন করিতে হইবে, অর্থাৎ কোন জেলার, কোন গ্রামের কোন শ্রেণীর লোক—পুরুষ বা স্ত্রীলোক যেরূপ ভাবে শব্দ উচ্চারণ করে, তাহার মুখে ঠিক তদ্রূপ শব্দ দিতে হইবে। যথা—জেলের ভাষা, ঢুলীর ভাষা, বাগ্দীর ভাষা, বখাটে ছেলের ভাষা, ভট্টাচার্যির ভাষা, মেয়েদের ভাষা অর্থাৎ বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বিভিন্ন শব্দ ও উচ্চারণ দিবে, কিন্তু অপর জায়গায় অভিধানের শব্দ দিবে।'[৪১]

এই রীতিকে গ্রহণ না করে প্যারীচাঁদ ও মধুসূদনের পরে কালীপ্রসন্ন সিংহ কলকাতার নিজস্ব ভাষায় লিখলেন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২)।[৪২] বাস্তবিকপক্ষে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' অন্যান্য রচনার তুলনায় অভিনব। লেখক কোথাও সাধু-চলিত মিশিয়ে লেখেননি; শুধু তাই নয়, বানানেও মৌখিক বিকৃতিগুলিকে যথাযথ রেখেছেন। আমরা মুখে বলি—ক্যামন, কত্তে, আচেন, গ্যাল, বন্দ—কিন্তু লেখার সময় লিখি—কেমন, করতে, আছেন, গেল, বন্ধ ইত্যাদি। ভিন্ন প্রদেশবাসীরাও এ নিয়ে অভিযোগ করে বলেন, 'আপনারা গ্রন্থে লিখেন—'মহাশয়', উচ্চারণ করিবেন 'মশাই', লিখেন 'যাইতেছি', 'খাইব', উচ্চারণ করিবেন 'যাচ্ছি', 'খাবো', লিখিবেন 'এক' বলিবেন 'অ্যাক'··· অর্থাৎ বাংলা গ্রন্থের ভাষা এক প্রকার হইল, কথোপকথনের ভাষা অপর প্রকার হইল।'[৪৩] কিন্তু হুতোম তা করেননি। তাঁর মুখের ভাষা

ও লেখার ভাষা প্রায় এক—ব্যঙ্গের চাবুক এই ভাষাতেই ঝলসে ওঠে।

'আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্ম সমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করেছেন—আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসী উচ্ছুগ্‌গু করবেন। এবারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য বড় ধূম করে কালীপুজো করেছিলেন ও বিধবা বিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর খেতেও ক্রুটি করেননি। আজকাল ব্রাহ্মধর্মের মর্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়াকান্না কাঁদতেও হবে?'[৪৪]

কিংবা, 'আমাদের শহরে বড়মানুষদের মধ্যে অর্‌গুণ নাই, বর্‌গুণ আছে। 'ভাল কত্তে পারব না মন্দ কর্‌ব, কি দিবি তা দে'। যে ভাষা কথ্য আছে, এঁরা তারই সার্থকতা করেচেন—বাবুরা পরের ঝক্‌ড়া টাকা দিয়ে কিনে 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' হতে চান—অনেকে আড়ি তুলতেও এই পেশা আশ্রয় করেচেন। যদি এমন পেশাদার না থাক্‌তো, তা হলে শিবকেষ্টর কে কি কত্তে পাত্তো?'[৪৫]

এই হুতোমী ভাষাতেও যে তৎসম শব্দ নেই তা নয়, 'বিধিপূর্বক', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'শ্রীবিষ্ণু স্মরণ', 'ব্রাহ্মধর্মের মর্ম', 'চক্ষু মুদ্রিত', 'সার্থকতা', 'আশ্রয়' প্রভৃতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এতে আছে কলকাতার মৌখিক ভাষার বৈশিষ্ট্যটি। মনে হয়, স্বামীজী যে কলকাতার ভাষার ওপর জোর দিতে চেয়েছিলেন সে এই প্রাণবন্ত ভঙ্গি বা বৈশিষ্ট্যের জন্যই। যাঁরা কলকাতার ভাষার বিকৃতিটুকুকেই বড় করে দেখেছিলেন স্বামীজী তাঁদের দলভুক্ত নন, তিনি এর অন্তর্নিহিত শক্তিটিকে অসামান্য ধীশক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তৎসম শব্দের সঙ্গে কলকাতার ভাষার অবাধ মিশ্রণেও তাঁর আপত্তি ছিল না। প্রসঙ্গত বলা চলে, অনেকেই মনে করতেন চল্‌তি ক্রিয়াপদের সঙ্গে তৎসম কথা খাপ খায় না এবং এ দুই করলে 'ভাষা বিট্‌কেল হয়'। 'সবুজপত্র'-বিরোধীদের এই মন্তব্যে প্রমথ চৌধুরী শুধু বলেছিলেন, 'এ-কাজ কথকেরা চিরকালই করে আসছেন এবং বক্তারা নিত্য করেন। অথচ কি কথকতা কি বক্তৃতা

কারও কানে বিটকেল ঠেকে না।'[৪৬] স্বামীজীও ছিলেন অসামান্য বক্তা, সেইজন্যে তাঁর জানা ছিল ভাষায় শক্তি ও সৌন্দর্য কিভাবে আরোপ করা যায়।

পুনরায় হুতোমের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। হুতোম দেখেছিলেন, তৎকালীন কলকাতার লোকের কুঅভ্যাস শোধরাতে গেলে ঝাঁজালো ভাষা চাই। সেই প্রয়োজন হুতোমী ভাষা মেটাতে পেরেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমী ভাষার শক্তিকে স্বীকার করেননি। বলেছিলেন, 'হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই, হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয় সেখানে পবিত্রতাশূন্য।'[৪৭] কিন্তু হুতোমের নিজের ভাষায়, 'হুতোমের নকশা বঙ্গসাহিত্যে নূতন গহনা ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি।'[৪৮] আমাদেরও তাই মনে হয়। সমসাময়িক যুবমানসেও নকশাটি প্রভাব-পাত করেছিল। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখছেন, 'আমরা তখন নিতান্ত বালক, তাহার ভাষার ভঙ্গীতে, রচনার রঙ্গেতে একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম। মনে করিলাম, আমাদের বাংলা ভাষাতে বাজি খেলান যায়, ফুল কাটান, ফুয়ারা ছুটান যায়। মনে করিলাম, আমাদের মাতৃভাষা সর্বাঙ্গে রঙ্গময়ী।'[৪৯]

হুতোমী ভাষা সেকালে অনেককেই কলকাতার সমাজচিত্র অঙ্কনে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় হুতোমের ছদ্মবেশী কালীপ্রসন্নকে ব্যঙ্গ করে লিখলেন 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' (১৮৬৩)। এছাড়াও কয়েকটি নকশাজাতীয় গ্রন্থ এসময় লেখা হল। যেমন, ক্ষেত্রমোহন ঘোষের 'কাকভুষুণ্ডীর কাহিনী' (১৮৬৫), ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সমাজ কুচিত্র' (১৮৬৫), রামসর্বস্ব ভট্টাচার্যের 'আসমানের নকশা: পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' (১৮৬৫), চুনিলাল মিত্রের 'কলিকাতার নুকোচুরি' (১৮৬৯), হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের 'কলিকাতার হাটহদ্দ' (১৮৬৯) কেদারনাথ দত্ত ('ভাঁড়')-রচিত 'সচিত্র গুলজারনগর' (১৮৭১), অক্ষয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাজ রহস্য' (১৮৭২), কেদারনাথ রায়ের 'বলিহারি কলকাতা'

(১৮৭৪) প্রভৃতি প্রায় ছুশো নকশার সন্ধান পাওয়া যায়। এদের সবার ভাষা যে চলিত ভাষা তা নয়। 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'র ভাষা সাধু ও চলিত মিশ্রিত।

'দাদাঠাকুর প্রথমেই মাচ ঘাই দেওয়া বাটিতে গমন করিলেন এবং নিত্য নিত্য পূজা করিতে গিয়া যেমন মা কোথা, খুড়ী কোথা এবং বড়দিদি মেজদিদি ও ছোড়দিদি তোরা কোথা গো বলিয়া অন্তঃপুর মধ্যে মেয়েদের নিকটে ঘরের ছেলের মতন গোল করিয়া থাকেন, সেদিনও সেইমত আরম্ভ করিলেন···'দিদি তোমরা আছ বোলে তাই বেঁচে আছি তোমাদিগের জন্যেই পূজা কোত্তে আসি এ তোমারদিগের তেমন দাদা-ঠাকুর নন, যেখানে মুখ মিষ্টি পান সেখানে গোলাম বোনে গিয়ে পায়ের কাঁটা দাঁতে কোরে তোলেন, আর যেখানে মানের লাঘব হয় সে জায়গা মাড়ান্ না। আমার সঙ্গে অনেক বড় মান্ষের আলাপ আছে, তাঁরা আমাকে নবাব স্থবোর অপেক্ষা খাতির যত্ন করেন। তুমি যদি একদিন দেখো তা হোলে অবাক হোয়ে থাক্‌বে। আজ সকালে অমুক বাবুর বাটিতে গিয়েছিলেম, বাবু যে খাতির কোল্লে তা আর বোল্‌ব কি ?'[৫০]

এখানে একই সঙ্গে ছুটি রীতির মিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু বড় হয়ে উঠেছে কলকাতার বাগবৈশিষ্ট, তার বিশিষ্ট চরিত্রগুণ। বরং 'সচিত্র গুল্‌জার-নগর'-এর লেখক হুতোমের মতোই সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, 'যে দিগে চাই সব অন্ধকার, সব মায়া জড়ান ভোজবাজীর খেলা, মায়ায় মোজে আমাদের স্থখ নষ্ট হলো, পরের জন্যে কাতর হয়ে—পরের মন যুগিয়ে পিঁজরের পাখীর মতন পরের বশে থেকে আমরা আশা স্থখ সকলি খোয়ালেম। আমরা একদণ্ড স্বাধীন নই, কেউ আমাদের নয় তবু আমার আমার কোরে অস্থখেতে দিন গেল। আমাদের ধর্ম প্রেমময়, তাতে কাঁটা নাই, খোঁচা নাই, মাচ্‌কোফের নাই, মন এর গোড়া, সরলতা এর পাতা, দয়া, দান ডালপালা আর ভক্তি এর গুঁড়ি। পরের সোনার জিনিস মাটির মতন দেখ, পরপুরুষকে ভায়ের মতন দেখ, পরস্ত্রীকে ভগ্নীর মতন দেখ আর সকলি প্রেমময় জান।'[৫১]

দেখা যাচ্ছে, কলকাতার ভাষা ছুটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাফল্য অর্জন

করেছিল এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। প্রথমটি হল বাংলা নাটকের সংলাপে, দ্বিতীয়টি হল সামাজিক নকশা ও প্রহসনজাতীয় রচনায়। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র কথা আগেই বলেছি। স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় এই প্রহসনটির বহু সংলাপ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। স্বামীজীর সমসাময়িক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অমৃতলাল বসুর নাটকে উত্তর কলকাতার ভাষা প্রাধান্যলাভ করে। গিরিশচন্দ্র বাগবাজার অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন; তাই তাঁর রচনায় ঐ অঞ্চলের ভাষার বহুল ব্যবহার চোখে পড়ে। যেমন 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের উক্তি, 'মা তুমি মাতালের পিত্তেস কর? জোচ্চোরের পিত্তেস কর? বিশ্বাস-ঘাতকের পিত্তেস কর? এমন পিত্তেস রেখ না।'— বারবার 'পিত্তেস' শব্দটি ব্যবহার করে তিনি সংলাপে যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছেন তা বিশেষভাবে উত্তর কলকাতার উচ্চারণ-প্রসূত। গিরিশচন্দ্রের রচনায় এ ধরনের আরও বহু শব্দ আছে—'বেল্‌কোপনা', 'বেইমশাই', 'নরুকে মিন্সে', 'চিকিচ্ছে', 'দাদার ঠেঙে শোনা', 'তোয়ের', 'চালকুম্‌ড়ী কর', 'ঠেঁয়ে', 'হকের টাকা ডোব্বার নয়' ইত্যাদি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' কিংবা অমৃতলাল বসুর নাটকে কলকাতার ভাষার যথেচ্ছ প্রয়োগ চোখে পড়ে। দু-একটি উপন্যাসের ভাষাও ক্রমশ সরল হয়ে আসছিল, তবে এ-সব ক্ষেত্রে কলকাতার ভাষা সচেতনভাবে প্রয়োগ করা হয়নি, হয়েছে চলিত ভাষার সঙ্গে অবাধ মিশ্রণে। এই মিশ্রণ রোধ করা লেখকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শিবনাথ শাস্ত্রী ও যোগেন্দ্রনাথ বসুর উপন্যাস সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলে। এ-সময় দু-একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল, রঙ্গ-ব্যঙ্গ পরিবেশনই যাদের লক্ষ্য, তারাও সাধু-মিশ্রিত কথ্য ভাষা ব্যবহার করত। এদের মধ্যে 'বসন্তক' পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য। অমৃতলাল বসুর নাটকে বরং কলকাতার ভাষা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল,

'না, দিব্যি গাল্লেম, কলকেতায় থাকতে আর চুল ছাঁটচিনি, বেটা করেছে কি? সামনে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল রেখে ঘাড়টা একেবারে মুড়িয়ে দিয়েছে।' (চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে)

কিংবা,

'কি রাধে, আর যে আমার সঙ্গে কতা-টতা কচ্চিসনি? বলিছিলি আমি একটা বে থা কল্লে তুই আমার বউকে কত যত্ন করবি। ছেলে-পুলে মানুষ করবি। এখন কি বলিস।' (খাসদখল)

এইসব নাটক ছাড়াও অমৃতলালের স্মৃতিকথায় ও অন্যান্য আরও দু-একটি বঙ্গনারীর স্মৃতিকথায় কলকাতার ভাষার লিখিত রূপ চোখে পড়ে। তবে এ-সব স্মৃতিকথা আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হয়েছে অনেক পরে, এই শতকের মাঝামাঝি সময়ে। যেমন ধরা যাক, কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী কৈলাসবাসিনী দেবীর আত্মকথা। তিনি তাঁর হিসেবের খাতার এক পাতায় হিসেব লিখতেন, অপর পাতায় নিজের কথা। লিখতেন কলকাতার নিজস্ব ভাষায়, সাধু ও চলিত মিশিয়ে। যেমন, 'বাবু বললেন, তোমার কথাতে আমার বড় সাহস হল। আমি জতোখন থাকিবো এ পৃথিবিতে ততখোন তোমায় কোন কেলেশ দিবো না। আমি যদি রাস্তাতে পাতোর ভাঙ্গি তবু তোমায় কষ্ট দেবো না। কিন্তু আমি পরম আমোদিত হইলাম তোমার সাহস দেকে। আমি আমার জন্যে কখন দুঃখিত হই নাই। কেবল পাছে তোমার কোন কষ্ট হয় তাহা আমি কেমন করে দেকিবো। তোমার কথাতে জানিলাম যে তুমি আমার কর্তে সাহসি, আমার কর্তে বুদ্ধিমান, আমার কর্তে তোমার সহ্যগুণ বেশী আছে। ইহাতে আমার সকল কষ্ট গেলো।'[৫২]

এই লেখাটি পড়ে বোঝা যায়, উনিশ শতকে কলকাতার ভাষার মৌখিক রূপটি মোটামুটি কেমন ছিল। কৈলাসবাসিনী লেখিকা ছিলেন না, সচেতনভাবে সাহিত্যচর্চা করার কথা তাঁর মনেও হয়নি কখনো, অনুসন্ধান করেননি কলকাতার ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি কোথায়। কিন্তু লেখবার সময় সাধু ভাষার সঙ্গে সঙ্গে যে ভাষা এসে আপনি তাঁর কলমে আশ্রয় নিয়েছে সেটি তাঁর কথ্য ভাষা, চিন্তা করবার ভাষা—এই ভাষাতেই তিনি কথা বলতেন, মনের কথা গুছিয়ে ভাবতেন। তাই 'চেয়ে' বা 'হইতে' না লিখে তিনি লিখেছেন 'কর্তে'। এখানে এই 'কর্তে' শব্দই তাঁর ভাবপ্রকাশে সাহায্য করেছে বেশি।

ব্যাপকভাবে না হলেও বাঙালী মনীষীদের অনেকেই কলকাতার ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছিলেন। তবে বিষয়টি ভাবনা-চিন্তার স্তর পেরিয়ে, প্রহসন, নাটক বা দু-একটি অল্পশিক্ষিতা নারীর আপনকথা ছাড়া সর্বত্র বিস্তারলাভ করেনি।

স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা রচনায় মনোযোগী হন উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষে। তাঁকে নিয়েই আমরা এই কালসীমার সমাপ্তি নির্দেশ করতে পারি। তিনি অতি সহজ বাংলায় মুখের ভাষার মতো সাবলীলভাবে প্রবন্ধ রচনা করলেন এবং প্রমাণ করলেন চলিত ভাষায়, শুধু চলিত ভাষা কেন কলকাতার ভাষাতেও গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লেখা সম্ভব, বিশুদ্ধ কৌতুকরসে পূর্ণ সন্ন্যাসীর ভ্রমণ কাহিনী রচনা করা যায়, শুধু তাই নয়, এক অত্যাশ্চর্য জীবনস্পন্দন সঞ্চার করা যায়।

'আজ সাতদিন হল আমাদের জাহাজ চলছে, রোজই তোমায় কি হচ্চে না হচ্চে খবরটা লিখবো মনে করি, খাতা-পত্র কাগজ-কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিন্তু—ঐ বাঙালী 'কিন্তু' বড়ই গোল বাঁধায়। একের নম্বর—কুঁড়েমি। ডায়েরি, না কি তোমরা বলো, রোজ লিখবো মনে করি, তারপর নানা কাজে সেটা অনন্ত "কাল" নামক সময়েতেই থাকে; এক পাও এগুতে পারে না। দুয়ের নম্বর—তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না! সেগুলো সব তোমরা নিজগুণে পূর্ণ করে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া করো তো, মনে করো যে, মহাবীরের মতো বার তিথি মাস মনে থাকতেই পারে না—'রাম' হৃদয়ে ব'লে। কিন্তু বাস্তবিক কথাটা হচ্ছে এই যে, সেটা বুদ্ধির দোষ এবং ঐ কুঁড়েমি।'[৫৩] আমাদের মুখের ভাষা ও লেখার ভাষার সঙ্গে পরিব্রাজকের ভাষার বিশেষ পার্থক্য নেই। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দেই আমরা আধুনিক বাংলা ভাষাকে যথাযথরূপে পেয়ে গেলুম স্বামীজীর রচনার মধ্য দিয়ে।

এ প্রসঙ্গে আমরা আর-একটি গ্রন্থের কথা স্মরণ করতে পারি, সেটিও পত্রগ্রন্থ, কিশোর রবীন্দ্রনাথের লেখা 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'। পত্র-গুলি 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সালে। এই পত্রধারার ভাষাও সাধু নয়, চলিত এবং এর সরসতা ও প্রাণচাঞ্চল্যকে পরিণত বয়সেও

রবীন্দ্রনাথ অগ্রাহ্য করতে পারেননি। ১৯৩৬ সালে বলেছেন, 'এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে, সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারিনে কিন্তু আমার বাংলা সাহিত্যে চল্‌তি ভাষায় বই লেখা এই প্রথম। আজ এর বয়স হল প্রায় ষাট। সে ক্ষেত্রেও আমি ইতিহাসের দোহাই দিয়ে কৈফিয়ত দাখিল করব না। আমার বিশ্বাস চল্‌তি ভাষার সহজ-প্রকাশ-পটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।'[৫৪] ১৯৩৬ সালে এই চিঠি লেখার অনেক আগে কবি আর-একবার লিখেছিলেন, 'আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয় স্বজনের সহিত মুখোমুখি একপ্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।'[৫৫]

ঠিক এ-কথাই স্বামীজী বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে। বরং তিনি এ-ব্যাপারে আরও বেশি প্রগতিশীল বললে অত্যুক্তি হবে না। তিনি 'কুণ্ঠিতভাবে সাহিত্যে চলিত ভাষার আংশিক প্রবর্তনের কথা বলেননি. পরন্তু সর্ববিধ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, উচ্চতম জ্ঞানবিজ্ঞান প্রকাশের ক্ষেত্রেও, চলিত ভাষা প্রবর্তনের পক্ষে প্রচণ্ড শক্তিশালী যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন।'[৫৬] অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনকে লেখা চিঠিপত্রের ভাষাই শুধু নয়, যে কোনো গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তুকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধের ভাষাও হবে মুখের ভাষার মতো অকৃত্রিম।

রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে'র ভাষা সত্যিই সহজ সুন্দর ও সাবলীল। 'শহরের চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করবার বাসনা ছিল,...কিন্তু শুনলেম গাধায় চড়ে বেড়ানো ছাড়া শহরে বেড়াবার আর কোন উপায় নেই। শুনে শহরে বেড়াবার দিকে টান আমার অনেকটা কমে গেল। তারপর শোনা গেল, এদেশের গাধাদের সঙ্গে চালকের সকল সময়ে মতের ঐক্য হয় না, চালক যেদিকে যাবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন গাধাটির সকল সময় সেদিকে যাবার ইচ্ছে হয় না—তাঁরও একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছে আছে—এই জন্যে সময়ে সময়ে দুই ইচ্ছের বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রায় দেখা যায় গাধার ইচ্ছে পরিণামে জয়ী হয়।'[৫৭]

যদিও ইতিহাসের বিচারে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'কে প্রথম চলিত ভাষায় লেখা গ্রন্থ বলে গ্রহণ করা যায় না, তবু এর ভাষা সময়ের বিচারে যথেষ্ট আধুনিক। স্বামীজীর ভাষার মতো স্বতস্ফূর্ত না হলেও আন্তরিক। এরপর দীর্ঘদিন রবীন্দ্রনাথ চলিত ভাষায় আর কিছু লেখেননি, পুনরায় তিনি যখন চলিত ভাষার প্রতি মনোযোগী হলেন তখন স্বামীজী বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে একটি নতুন পথের সন্ধান এনে দিয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য

পূর্বোদ্ধৃত উদাহরণগুলি প্রমাণ করে যে, স্বামীজীর বাংলাসাহিত্য-চর্চার বহুদিন আগেই কলকাতার ভাষা সাহিত্যে প্রবেশাধিকার লাভই শুধু করেনি, বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। তাহলে স্বামীজীর রচনার বৈশিষ্ট্য কি? সাম্প্রতিককালের এক সমালোচকের মতে, 'সাহিত্যের এই রীতির (চলিত ভাষার ভিত) প্রথম সূচনা করলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ—তাকে শ্রী ও মর্যাদা দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।'[৫৮] কিন্তু স্বামীজী কালীপ্রসন্নের ভাষার ভিতের ওপরে ইমারত গড়েছেন বলে মনে হয় না। বরং বলা চলে, 'তিনি আপন ব্যক্তিত্বগুণে এবং সহজ প্রেরণাবশেই তাঁর নিজস্ব রীতির প্রবর্তক—অর্থাৎ গদ্যরীতিতে তিনি মার্জিত কালীপ্রসন্ন নন।'[৫৯] কিন্তু স্বামীজীর নিজস্ব রীতিটি কি?

সাহিত্যে কলকাতার ভাষার ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও সে ভাষা উনিশ শতকে সাধু ভাষার সম-মর্যাদা পায়নি। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কলকাতার ভাষায় সাহিত্যচর্চাও সম্ভব ছিল না। রঙ্গ-ব্যঙ্গপ্রধান নকশা-জাতীয় রচনা ও নাটকেই এ ভাষার ব্যবহার হত, কিন্তু কোনো গভীর মননধর্মী রচনা কলকাতার ভাষায় লেখা হত না। হুতোমী ভাষায় গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখা যায় না। সম্ভবত স্বামীজীর আগে কেউ মননশীল প্রবন্ধ লেখার সময় এ-কথা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারেননি। তাই বলব, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র,

অমৃতলাল প্রমুখ সকলেই চলিত ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'কিন্তু সর্ব কর্মে চলিত ভাষা প্রয়োগ করতে হবে এ-কথা বিবেকানন্দের পূর্বে কোনো বাঙালী সাহিত্যিক বলেননি।'[৬০] তিনি যে-কোনো চিন্তার ব্যাপার, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, তত্ত্বালোচনা—সর্বত্রই অবলীলায় কলকাতার ভাষা ব্যবহার করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর মতামত দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, 'চলিত ভাষায় কি আর শিল্প-নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরের কথা কও, তাতেই তো এ সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূত-কিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে ও পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর?'[৬১] যা স্বাভাবিক তার সঙ্গে কৃত্রিম পাল্লা দিয়ে চলতে পারে না। আটপৌরে ভাষার তীক্ষ্ণতা সাধু ভাষার গদাইলস্করি চালে দুর্লভ। স্বামীজীর ভাষায়, 'ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।'[৬২] স্বামীজীর নিজের লেখাতেও ভাষার এই শাণিত দীপ্তি চোখে পড়ে, বাংলাসাহিত্যে যার তুলনা মেলে না।

দ্বিতীয়ত বলা চলে স্বামীজী এই ভাষায় তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছিলেন। যে ওজস্বিতা সাধুভাষায় বর্তমান, কলকাতার মৌখিক ভাষায় তার একান্ত অভাব ছিল। স্বামীজীর পূর্ব পর্যন্ত এ ভাষা শুধু স্ত্রীলোকের ভাষা, অল্পশিক্ষিতের ভাষা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভাষা—অর্থাৎ এ ভাষা চেহারার প্রতিচ্ছবি, মুখভঙ্গির বিকৃতিটুকু ধরে রাখতে পারত, চরিত্রের ওজস্বিতা, মানবিক ব্যক্তিত্ব-প্রকাশে সক্ষম হয়নি। কিন্তু স্বামীজী যখন বললেন,

'তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাবো, ওটা কল্পনা। ভারতেও বল আছে, মাল আছে—এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ

যে আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।'[৬৩] তখন সমস্ত রচনাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ এসে পড়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এই আশ্চর্য প্রাণবন্ত ভাষাভঙ্গির জন্য অন্য কোনো বাঙালী লেখকের কাছে ঋণী ছিলেন না। বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ঠিকই, দীনবন্ধু-গিরিশচন্দ্র প্রমুখ নাট্যকারের রচনা ও মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল সে-কথাও সত্যি, তবু মনে হয়, সমসাময়িক বাংলাসাহিত্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। 'পরিব্রাজকে' বাঙালী কবিদের প্রতি তাঁর ব্যঙ্গোক্তি থেকেই তা বোঝা যায়,

'ঐ যে একদল দেশে উঠছে, মেয়েমান্‌ষের মতো বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের ওপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হ'য়ে অবধি পীরিতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাঁসেন হোঁসেন' করেন—ওরা কেন যাক না বাপু সিলোনে। পোড়া গভর্নমেণ্ট কি ঘুমুচ্চে গা ? সেদিন পুরীতে কাদের ধরপাকড় করতে গিয়ে হুলস্থুল বাধালে ; বলি রাজধানীতে পাকড়া করে প্যাক করবারও যে অনেক রয়েছে।'[৬৪]

সবটাই সরসভাবে লেখা, বিশেষভাবে কাউকে কটাক্ষ করেও নয়। ব্যঙ্গের চাবুকের বদলে আছে প্রসন্ন রসিকতা। কবিদের প্রসঙ্গ এসেছে স্বতস্ফূর্তভাবে। এই কবি বা কবিগোষ্ঠী কারা সে নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন নেই। অনেকে মনে করেন, স্বামীজীর এ উক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রতি। আবার অনেকের মতে, তৎকালীন কবিগোষ্ঠীর প্রতি। কারণ বাংলাসাহিত্যে তখন গীতিকবিতা রচনার জোয়ার এসেছে। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যখন জাতীয় চরিত্রে দৃপ্ত পৌরুষ প্রত্যক্ষ করতে চাইছিলেন, চাইছিলেন আলস্য-জর্জরিত, কর্মবিমুখ জাতির মধ্যে চেতনা সঞ্চার করে পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করাতে, তখন বাঙালী কবিদের গীতিকবিতা-চর্চা তাঁর ভাল লাগেনি। 'গীতাঞ্জলি'র কবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি, 'বলাকা'র কবির সঙ্গেও না, হলে তিনি নিশ্চয় মুগ্ধ হতেন। কারণ

প্রথম যৌবনেই তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে দু-একটি গান গাইবার জন্য তালিম নিয়েছিলেন এবং নিজের সঙ্গীত-সঙ্কলনে একটি রবীন্দ্র সঙ্গীতকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। যে-কোনো ভাল জিনিসকেই চিনতে পারার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা স্বামীজীর প্রথম থেকেই ছিল, কিন্তু তাকে গ্রহণ করবার সময় তিনি দেশ-কাল-মানসিকতা প্রভৃতির বিচার করতেন। যাক সে কথা, স্বামীজী বাংলা ভাষায় শক্তিসঞ্চার করবার জন্য কথ্য ভাষার অপূর্ব ভাবভঙ্গি সংগ্রহ করেছিলেন সমকালীন সাহিত্যিকগোষ্ঠীর কাছ থেকে নয়, তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছ থেকে। পরমহংস-দেবের বাণী ও উপদেশপূর্ণ 'কথামৃত' পড়লে দেখা যায় হুগলী জেলার গ্রাম্য টান মেশানো তাঁর সরল অনতিমার্জিত বাণীতে মিশে আছে এক অত্যাশ্চর্য রসপ্রবাহ।

'একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত প'ড়ে লোক মনে করে, আমি সব বুঝে ফেলেছি। চিনির পাহাড়ে একটা পিঁপড়ে গিছ্‌লো। এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভ'রে গেল। আর এক দানা মুখে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে, এবার এসে পাহাড়টা সব নিয়ে যাব!' (কথামৃত)

কিংবা,

'বিষয়ী লোকদের রোক নাই। হোলো হোলো; না হোলো না হোলো। জলের দরকার হয়েছে, কূপ খুঁড়ছে। খুঁড়তে খুঁড়তে যেমন পাথর বেরুলো, অমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গা খুঁড়তে বালি পেয়ে গেল; কেবল বালি বেরোয়। সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছে, সেখানেই খুঁড়বে তবে ত জল পাবে।' (কথামৃত)

'সকলকেই দেখি, মেয়েমানুষের বশ। কাপ্তেনের বাড়ি গিছ্‌লাম; —তার বাড়ি হয়ে রামের বাড়ি যাব। তাই কাপ্তেনকে বল্লাম, 'গাড়ীভাড়া দাও'। কাপ্তেন তার মাগকে বল্লে! সে মাগও তেমনি— 'ক্যাহুয়া' 'ক্যাহুয়া' করতে লাগল। শেষে কাপ্তেন বল্লে যে,

ওরাই (রামেরা) দেবে। গীতা ভাগবত বেদান্ত সব ওর ভেতরে।' (কথামৃত)

অথবা,

'তাঁকে সর্বভূতে দর্শন করতে লাগলুম! পুজো উঠে গেল! এই বেলগাছ! বেলপাতা তুলতে আসতুম! একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁশ খানিকটা উঠে এলো। দেখ্‌লাম গাছ চৈতন্যময়! মনে কষ্ট হলো। দূর্বা তুলতে গিয়ে দেখি, আর সেরকম করে তুলতে পারিনি। একদিন ফুল তুলতে গিয়েছি, দেখিয়ে দিলে, গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট্—পূজা হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া! আর ফুল তোলা হল না!' (কথামৃত)

উদ্ধৃতিগুলিতে আমরা দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাচনভঙ্গির বৈশিষ্ট্য হল, প্রথমত, উপমার আশ্চর্য সুপ্রয়োগ এবং সেই মৌলিক উপলব্ধির সজীবতা। দ্বিতীয়ত, চল্‌তি ভাষার মাধ্যমে শাস্ত্রের গূঢ়তম সত্যকে প্রকাশ করার ক্ষমতা এবং তৃতীয়ত, সহজ রসজ্ঞানে সুপটুতা।[৬৫]

স্বামীজী ঠাকুরের এই বাগ্‌বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন। যদিও উভয়ের মুখের ভাষা এক অঞ্চলের ছিল না, তবুও তিনি তাঁর শিষ্যকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় সকল জিনিসের মতো ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন এরূপ হয়েছে বলে বোধ হয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষার আবার নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।'[৬৬] বাংলা ভাষাকে নতুন ছাঁচে নতুন করে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন সাহিত্যিকদের ভাষা তাঁর ভাল লাগেনি; 'এখনকার বাঙলা-লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশি verbs (ক্রিয়াপদ) use (ব্যবহার) করে: তাতে ভাষার জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষায় বেশি জোর হয়।'[৬৭] বাংলা ভাষায় তেজস্বিতার অভাব অনুভব করে স্বামীজী তার প্রতিকার করার চেষ্টা করেছিলেন নানাভাবে। গঠনরীতি সম্বন্ধেও তাঁর নিজস্ব মতামত লক্ষণীয়—

'ভাষার ভেতর verb (ক্রিয়াপদ)-গুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস?—ঐরূপে ভাবের pause (বিরাম) দেওয়া; সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মতো দুর্বলতার চিহ্নমাত্র। ঐরূপ করলে মনে হয়, যেন ভাষার দম নেই। সেইজন্য বাংলা ভাষায় ভাল lecture (বক্তৃতা) দেওয়া যায় না। ভাষার উপর যার control (দখল) আছে, সে অত শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ভাব থামিয়ে ফেলে না। তোদের ডালভাত খেয়ে শরীর যেমন ভেতো হয়ে গেছে, ভাষাও ঠিক সেইরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আহার, চালচলন, ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়।'[৬৮]

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল কিন্তু প্রয়োজন ছিল। বাংলা ভাষার ভাব ও রূপ সম্বন্ধে স্বামীজী কত ভেবেছিলেন এটি তারই একটি উদাহরণ। 'বর্তমান ভারতে'র ভাষাও তার অন্যতম পরিচয়। শিষ্যকে আরও বলেছিলেন, 'বাঙলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে করছি। সাহিত্য-সেবীগণ হয়তো তা দেখে গালমন্দ করবে। করুক, তবু বাঙলা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করব।'[৬৯]

স্বামীজীর অনুমান মিথ্যে হয়নি। বাংলা ভাষাকে নতুন ছাঁচে গড়বার চেষ্টা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সমালোচকদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাঁর গুরুগম্ভীর সাধু ভাষা ও অতি-সরল কথ্য ভাষা কোনটিই সমালোচনার হাত থেকে সেদিন রক্ষা পায়নি। স্বামীজী তাঁর শিষ্যকে কথাগুলি বলেছিলেন ১৮৯৮ সালের নভেম্বর মাসে। মনে হয়, এ সময়ে কিছুদিন ধরেই তিনি বাংলা ভাষার কথা ভাবছিলেন, কারণ 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাব সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার চিন্তা তাঁকে ভাষা সম্বন্ধে ভাবিয়ে তুলেছিল। এর কিছুদিন আগে (১৮৯৭) তিনি 'হিন্দুধর্ম কি' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।[৭০] এবং পরিচিতদের অভিমত শোনেন, 'কটমট বাংলা হয়েছে।' 'হিন্দুধর্ম কি'-র ভাষা তৎসম শব্দবহুল সাধু ভাষা, দুর্বোধ্য নয়

কিন্তু নিঃসন্দেহে কঠিন এবং 'বর্তমান ভারতে'র সমগোত্রীয়। 'বর্তমান ভারত' প্রকাশের সময়েও (মার্চ, ১৮৯৮) অনেকে অভিযোগ করেছিলেন, 'উহার ভাষা অতি জটিল ও দুর্বোধ্য' বলে।[৭১] স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থের ভূমিকায় ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে সম্ভবত ঈষৎ বিব্রত হয়েই লিখেছিলেন, '… গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই 'বর্তমান ভারতে'র আলোচ্য বিষয়। ইহার ভাষা কেমন করিয়া আদি বা করুণরস সংঘটিত নভেল নাটকাদির তুল্য হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।'[৭২] কিন্তু স্বামীজী হতাশ হননি বা গৃহী লোকের 'কুয়ো খোঁড়া'র মতো অল্পেতেই হাল ছেড়ে দেননি। তিনি জানতেন দুটি কাজ তাঁকে করতেই হবে। এক, 'বেদ বেদান্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝিতে দিতে হবে এবং ঠাকুরের ভাব সব্বাইকে দেবার জন্য 'বাংলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা' আনতে হবে।' আর সেজন্য সর্বসাধারণের বোধগম্য একটি সহজ অথচ জোরালো ভাষা তৈরি করে নিতে হবে তাঁকেই।

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে, সাধু ভাষায় কিছু লেখার পরে স্বামীজী 'কিছু ধাক্কা খেলেন। তাঁর ভাষার দুরূহতার বিরুদ্ধে নিজ মহলেই সমালোচনা হল। বাইরে তো হলই। হয়ত বুঝলেন, পরীক্ষার ঝোঁকে এমন-কিছু দুষ্পাচ্য শব্দ গ্রহণ করেছেন, সেইসঙ্গে অতি কঠিন রীতি নিয়েছেন, তা বাঙালীর ধাতু সহ্য করতে সমর্থ নয়। তদুপরি নিশ্চয় সচেতন হয়ে উঠেছিলেন—আচার্যের কথায় ও কাজে ব্যবধান সম্বন্ধে। তিনি নিজে জনসাধারণের ভাষায় জ্ঞানবিস্তারের কথা এত বলেন—সেই তিনিই সে পথ ছেড়ে দিয়েছেন—কিংবা গ্রহণ করেননি !! কোথায় গেল তাঁর ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে এই আদর্শ ?'[৭৩]

এ অবশ্য অনুমানের কথা, তবে সম্ভবত অভ্রান্ত অনুমান। মৌখিক ভাষার শক্তি ও অকৃত্রিমতাও তাঁকে চলিত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট করে। এ সময় স্বামীজীর সামনে পূর্বসূরিদের ভাষারীতির যতই উদাহরণ থাকুক না কেন তাঁর হাতের কাছে ছিল তাঁর গুরুদেবের ভাষা। 'উদ্বোধনে'র প্রথম সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত

'পরমহংসদেবের উপদেশ'। সে ভাষা একই সঙ্গে সহজ, সরস, তীক্ষ্ণ ও গভীর।

'রত্নাকরে অনেক রত্ন আছে। তুমি এক ডুবে পেলে না বলে রত্নাকরকে রত্নহীন মনে করো না। সেইরূপ একটু সাধন-ভজন করে ঈশ্বরদর্শন হল না বলে হতাশ হয়ো না। ধৈর্য ধরে সাধন কত্তে থাকো, যথাসময়ে ঈশ্বরের কৃপা তোমার উপর হইবে।'[৭৪]

কিংবা,

'মৌমাছি যতক্ষণ ফুলের চারিদিকে গুন্‌গুন্ করে ততক্ষণ সে মধু পায় নাই। মধু পেলে সে আর গুন্‌গুন্ করে না, চুপ করে মধু পান করে। মানুষ যতক্ষণ ধর্ম লয়ে গোল করে ততক্ষণ সে ধর্মের আস্বাদ পায় নাই—পেলে চুপ করে যায়।'[৭৫]

প্রায় একই সময়ে 'মাস্টারমশাই'ও সহজ বাংলায় ঠাকুরের 'কথামৃত' প্রকাশে উদ্যোগী হন এবং সে রচনাও শ্রীম সম্ভবত স্বামীজীকে প্রকাশের পূর্বে দেখিয়েছিলেন।[৭৬] সুতরাং স্বামীজী স্থির করলেন তিনিও চলিত ভাষায় গুরুগম্ভীর বিষয় পরিবেশন করা সম্ভব কিনা পরীক্ষা করে দেখবেন। চলিত ভাষার আদর্শ হিসেবে কলকাতার ভাষার শক্তি সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না কিন্তু সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। তাই প্রথমে দুই ভাষাতেই লিখতে শুরু করলেন। তারই সঙ্গে চেষ্টা শুরু হল কলকাতার ভাষাকে প্রতিষ্ঠা দেবার।

স্বামীজীর চেষ্টার ফসল দেখা গেল আরও কিছুদিন পরে ১৮৯৯-এ 'ভাববার কথা' প্রকাশের সময় থেকে। পাক্ষিক 'উদ্বোধনে'র দশম সংখ্যায় প্রকাশিত হল 'বর্তমান ভারতে'র এক কিস্তি এবং লেখকের নামহীন একটি রচনা বা নকশা 'ভাববার কথা'। পুনরায় 'উদ্বোধনে'র চতুর্দশ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'ভাববার কথা'র বাকি অংশ। এর পরে 'উদ্বোধনে'র পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে 'বিলাতযাত্রীর পত্র' যা পরে 'পরিব্রাজক' রূপে পরিচিত হয়েছে। তারপরে তিনি আর সাধু ভাষায় কিছু লেখেননি, যা কিছু লিখেছেন

সবই চলিত ভাষায়।[৭৭]

এই চলিত ভাষা স্বামীজীর কথায় 'কলকেতার ভাষা'। কলকাতার লোকের বাক্‌রীতি ও উচ্চারণ-প্রবণতা ধরা পড়েছে স্বামীজীর কলমে, 'লিচু' হয়েছে 'নিচু', 'আম' হয়েছে 'আঁব', 'লখিন্দর' হয়েছে 'নকিন্দর'। সেই সঙ্গে এমন অজস্র তৎসম শব্দের পরিবর্তিত রূপ ছড়িয়ে আছে যা প্রাত্যহিক কথাবার্তায় আমরা প্রতিনিয়তই বলি—বৈরিগ্যি, যুগ্যি, পুষ্যি, গেরস্ত, বদ্দি, আদ্দেক, খদ্দের, মোচ্ছব, রোদ্দ‍ুর, সাধ্যি, নিশ্চিন্তি, মাগ্‌নি, পুত্ত‍ুর, পিত্তি, ভাগ্যি, রাজ্যি, বিত্তে, বে প্রভৃতি।

তিনি যখন লেখেন 'গপ্প মারা ঘন্টা নাড়ার কাল গেছে', 'আমি এদের পুষ্যিপুত্ত‍ুর', 'নিশ্চিন্তি হয়ে মরব' কিংবা 'এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন তো ঠাকুর আঁটকুঁড়ের বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন' তখন ভাষা হয়ে ওঠে সত্যিকারের ভাবের বাহন। আগেই বলেছি, ভাবপ্রকাশের জন্য শব্দ বাছাইয়ের কাজ খুব কঠিন। কারণ মানুষের জন্মগত সংস্কার ত্যাগ করা কাপড় ছাড়ার মতো সহজ নয়। কালে কালে ভাষার শব্দভাণ্ডার ক্রমশই সমৃদ্ধ হয়, কিন্তু যথা-শব্দ নির্বাচন করার সময় দেখা যায় মুখের ভাষাটিই সুপ্রযুক্ত হয়েছে, কেননা মুখের ভাষাই জীবন্ত, মুখের ভাষা জড়িয়ে আছে আমাদের সংস্কারের সঙ্গে, আমাদের উচ্চারণভঙ্গির সংস্কারের সঙ্গে। এখানে 'গপ্প মারা' শব্দ দুটি যে ভাব প্রকাশ করেছে, 'গল্প করা'র মধ্যে কখনই তা ফুটত না। স্বামীজী আমাদের ভাষার জন্য যথা-শব্দ সন্ধান করেছিলেন কলকাতার ভাষার মধ্যে। তাই ক্রিয়াপদে 'চ্চ' ও 'উ'-র ব্যবহার খুব বেশি চোখে পড়ে; যেমন, যাচ্চি, কচ্চি, ভিজুচ্চি, কচ্চে, ঘুমুচ্চে, যাচ্চেন, চিবুচ্চে, নিচ্চে, বেড়াচ্চে, তাড়াচ্চে, দৌড়ুচ্চে, ঠেঙাচ্চে, সামলাচ্চে, এগুচ্চেন, পোড়াচ্চে, খাচ্চেন, ঘামাচ্চেন, চিতুচ্চে, পেলুম, করলুম, ছুটলুম, ভাবলুম, ডিঙুলুম, এলুম, বেরুলুম, ছিলুম, বললুম, বাঁচলুম, ঠাওরালুম, গিয়েছিলুম, বেরুক, তিষ্ঠুনো, ভিজুক, ফুরুলে, হাসতুম, পৌঁছুল প্রভৃতি।

আগেই বলেছি, আমরা সাধু ও চলিতের পার্থক্য নির্ণয় করি ক্রিয়াপদের সংক্ষেপীকরণের মধ্য দিয়ে—'যাইতেছি' থেকে 'যাচ্ছি',

'পাইলাম' থেকে 'পেলাম'। কিন্তু স্বামীজী এভাবে ক্রিয়াকে ছেঁটেছুঁটে তাকে চলিতে রূপান্তরিত করেননি, তার বিশিষ্টতাকেও রক্ষা করেছেন।

'লেকচার করে বেড়াচ্চি।'

'তোমরা হচ্চ দশ হাজার বছরের মমি।'

'বাংলাদেশ আর বড় এগুচ্চেন না ঐ সোঁদরবন পর্যন্ত।'

'তাঁতের সঙ্গে এগুপেছুই কচ্চে।'

প্রসঙ্গত, মনে রাখতে হবে, আজ এই ভাষা ও শব্দ আমাদের চোখে বা কানে বিচিত্র বলে মনে না হলেও উনিশ শতকে এ ছিল অচিন্তনীয় ঘটনা—তখনও প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যক্ষেত্রে চলিত ভাষার জন্য ওকালতি শুরু করেননি, রবীন্দ্রনাথ সাধু ভাষাচর্চায় অব্যাহত। আর একজন অবশ্য মৌখিক ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন, তবে সে ভাষা ঠিক কলকাতার ভাষা নয়, রূপকথা বলার ভাষা। এই ভাষাশিল্পী হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৮৯৫ সালেই লিখেছিলেন 'ক্ষীরের পুতুল'। রূপকথার রূপ এবং রূপকথার রঙ দুই-ই সেখানে স্পষ্ট. 'এমনি করে দিন যায়। ছোট-রানীর সাতমহলে সাতশ দাসীর মাঝে দিন যায়। আর বড়-রানীর ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বাঁদর-কোলে দিন যায়। দিনের পরে দিন, মাসের পরে মাস, বছরের পরে বছর চলে গেল। বড়-রানীর যে দুঃখ সেই দুঃখই রইল—মোটা চালের ভাত, মোটা সুতোর শাড়ি আর ঘুচল না।'[৭৮]

এই রচনার আঙ্গিক স্বতন্ত্র। অবনীন্দ্রনাথ মুখের ভাষাকে অবিকল ভাবে গ্রহণ করতে গিয়ে ভাষাকে কিছুটা কৃত্রিম করে 'ইশচে', 'ছেরাবন', 'বেরতো' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তার ফলে ভাষাটি সর্বজনপ্রিয় হতে পারেনি। শুধু বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত একশ্রেণীর নবীন লেখক এই স্টাইল অবলম্বন করেছিলেন।[৭৯]

যাক সে কথা। কলকাতার ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা রূপে স্বীকৃতি দেবার জন্যে স্বামীজীকেও কম চেষ্টা করতে হয়নি। মনের ভাষা ও মুখের ভাষাকে এক করার রীতি তখনকার বাংলাসাহিত্যে ছিল না। তার ওপর স্বামীজী সাধু ভাষাতেই লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রথম

থেকেই তিনি পরিশীলিত চলিত ভাষার ব্যবহার বর্জন করে কলকাতার আপাত-অমার্জিত মৌখিক ভাষাতে সাহিত্যচর্চা করবেন স্থির করেছিলেন। তাই জাহাজের কেবিনে বসে তাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেখার কাজে ব্যাপৃত থাকতে হত। এ প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার একখানি চিঠির উল্লেখ করা চলে। নিবেদিতা চিঠিখানি লিখেছিলেন ১৮৯৯ সালের ১৯ জুলাই। তিনি লিখেছেন,

'রাজা (স্বামীজী) তাঁর বাংলা পত্রিকার জন্য ঘাড় গুঁজে দাসের মতো খাটছেন ক্যাবিনে বসে···বাংলা পত্রিকাটি তাঁর কাছে কী না আশীর্বাদের মতো হয়েছে তোমাকে তা জানানো দরকার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এর জন্য একটি দীর্ঘ পত্র রচনা করে চলেছেন, মজাদার, রসিকতায় তা পূর্ণ, সেইসঙ্গে টিপ্পনী, মন্তব্য এবং আর্ত ভবিষ্যৎবাণী। সমস্ত মন-প্রাণ ওতে ঢেলে দিয়েছেন। বিদেশিয়ানা, ব্রাহ্মপদ্ধতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে জ্বলন্ত রোষ, জনগণ সম্বন্ধে নিবিড় আশা ও ভালবাসা, গুরুর প্রতি দীপ্ত ভক্তি, চারিপাশের জীবন সম্বন্ধে ব্যাপক সন্ধানী দৃষ্টি —সর্বোপরি বাংলা ভাষার উপরে কিছুটা ইচ্ছাকৃত উৎপীড়ন, যার ফলে তাঁর লেখা বোঝা দুরূহ হয়ে উঠেছে [বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা নয় তাঁদের পক্ষে কক্নি সবসময়ই দুরূহ] ; যেমন ছিল কার্লাইলের প্রথম আবির্ভাব-কালের রচনা, যা সৃষ্ট হয়েছিল দারুণ কোনো লক্ষ্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে !'[৮০]

স্বামীজীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সময় 'উদ্বোধন' পত্রিকার নতুন ভাব ও ভাষা সকলকেই চমকে দিয়েছিল। স্বামীজীও যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েননি তা নয়। বিশেষ করে 'পরিব্রাজক' 'উদ্বোধনে' ধারাবাহিক প্রকাশিত হবার পর তদানীন্তন বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিরুদ্ধ সমালোচনা আরম্ভ হয়। প্রশংসা নয়, শুধুই নিন্দা। প্রাচীনপন্থী সমালোচকেরা সাধারণ কথ্য ভাষায় লেখা প্রবন্ধকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ তো করলেনই না, উপরন্তু বিরুদ্ধতা শুরু করলেন। 'হিতবাদী'র সহ-সম্পাদক পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর সহকর্মীদের কাছে স্বামীজীর বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। 'তাঁদের দল 'উদ্বোধন'কে উদ্বন্ধন-রূপ উচ্চারণ

করে (সাহিত্যের উদ্বন্ধন হচ্ছে বলে) ঠাট্টা করতে শুরু করলেন। এমনকি 'বঙ্গহিতৈষী'র মতো ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক পত্রিকাটি পর্যন্ত হিতৈষীর সুরে স্বামীজীকে বাংলা রচনা সম্পর্কে তাঁর গুরুভাই সারদানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্য পরামর্শ দিলেন।'[৮১]

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'বর্তমান ভারতে'র প্রশংসা করলেও 'বিলাত-যাত্রীর পত্র' প্রসঙ্গে লিখলেন, 'পত্রের ভাষার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এই সকল পত্রে অসংযত চলিত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার কি উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। বিশুদ্ধ ভাষাও সরল, প্রাঞ্জল ও সর্বসাধারণের বোধগম্য হতে পারে।'[৮২]

১৩০৭ সালে 'পূর্ণিমা' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় ছাপা হল, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যবৃন্দ যে সাময়িকপত্র প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে ছেব্‌লামি ভালো দেখায় না।' বিলাতযাত্রীর পত্র আবার স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রেরিত' শ্রীপদের উপর বিস্ফোটক! 'কেমন করে সে হাঙ্গরের পেট চেরা হল, কেমন রক্তের নদী বইতে লাগলো, কেমন করে সে হাঙ্গর ছিন্ন অন্ত্র, ছিন্ন দেহ, ছিন্ন হৃদয় হয়েও কতক্ষণ কাঁপতে লাগলো, নড়তে লাগলো, সব জিনিসেই সেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হতে লাগলো। বেদান্ত আজ পেটের দায়ের কাছে 'প্রায় মাটি'। ধন্য বিবেক।'[৮৩]

স্বামীজী অতঃপর কলকাতার ভাষার পক্ষে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেটিই তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'বাঙ্গালা ভাষা'। তাতে তিনি স্পষ্টই বললেন, "যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোন কাজের নয়।'[৮৪] আরও বললেন, 'ত্নটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে তা ত্ন'হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই।'[৮৫] এ ব্যাপারে স্বামীজী প্রমথ চৌধুরীর চেয়ে অনেক বেশি আধুনিক। প্রমথ চৌধুরী চেয়েছিলেন সাধু ভাষার পরিবর্তে কৃষ্ণনাগরিক পরিশীলিত ভাষা। কিন্তু স্বামীজী বুঝেছিলেন তা সম্ভব নয়। কোনো অঞ্চলের ভাষাই কলকাতার ভাষার কাছে দাঁড়াতে পারবে না। কর্মোপলক্ষে সব বাঙালী কৃষ্ণনগরে যায় না, কিন্তু কলকাতায় আসে। অন্যান্যরা স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তি তলিয়ে বোঝার চেষ্টাই করেননি। পূর্বোক্ত 'পূর্ণিমা' ১৩০৭-এর শ্রাবণে লিখেছিল,

'বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে এক পত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয় তাঁহার বিলাতযাত্রীর পত্রের ভাষা নানা সাময়িকপত্রে যে-সমালোচনা হইয়াছিল ইহা তাহারই জবাব। বলিতেছেন, সাধারণ লোকের ভাষাই ভাষা আর কলকেতার ভাষাই গ্রহণ করিতে হইবে। 'যে ভাষায় ঘরের কথা কও, তাতেই তো পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে করো, তবে লেখবার বেলায় একটা কী কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত করো?' জিজ্ঞাসা করি কোটেশনের মধ্যের ভাষাটা কিরূপ? 'কিম্ভূতকিমাকার' এটা পাণ্ডিত্য না সাধারণের ভাষা?'[৮৬]

এজাতীয় আরও বহু পত্রপত্রিকাই তখন সমালোচনায় মুখর হয়ে থাকতে পারে। স্বামী প্রেমঘনানন্দ সেজন্যই মন্তব্য করেছেন, '১৩০৬ সালের পয়লা ভাদ্র থেকে 'পরিব্রাজক' উদ্বোধনে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হবার পর তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিরুদ্ধ সমালোচনা আরম্ভ হয়।'[৮৭]

তবে 'প্রবাসী' সমকালে না হলেও ১৩১৩ সালের ভাদ্র সংখ্যায় 'পরিব্রাজকে'র আলোচনা করবার সময় তার ভাষার নিন্দে করলেও বিষয়বস্তুর প্রশংসা করে লিখেছিল, 'পুস্তকখানির ভাষায় দুটি দোষ দেখিলাম। স্থানে স্থানে ইয়ারকির হালকা সুরটার মাত্রা কিছু বেশি বোধ হইল। দু-এক জায়গায় 'স্ত্রী' শব্দের গ্রাম্য ইতর প্রতিশব্দ অকারণ ব্যবহৃত হইয়াছে।'[৮৮]

সেইসঙ্গে 'প্রবাসী' লেখে, 'ইহা যেমন সুখে আগ্রহের সহিত পড়া যায় তেমনই শিক্ষাপ্রদ। ইহার পত্রে পত্রে লেখকের স্বদেশহিতৈষণার ও স্বজাতির প্রীতি বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।'[৮৯] অন্যান্য অনেক লেখক যে স্বামীজীকে সমর্থন করেননি সে-কথা লিখেছেন ভূপেন্দ্রনাথ, 'রক্ষণশীল সাহিত্যিক মহল হতে তাঁর রচনাশৈলী সম্বন্ধে এল উন্নাসিক সমালোচনা এবং তাঁর বাংলা জ্ঞানের অভাবের জন্য পরোক্ষ পিঠ চাপড়ানোর মনোভাব।'[৯০] স্বামীজীর রচনার প্রতি তাঁদের এই বিরূপতা যে কতখানি তা বোঝা যায় অন্য আর-একটি ঘটনার সাহায্যে।

রবীন্দ্রনাথের মুখে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র প্রশংসা শুনে দীনেশচন্দ্র সেন এসেছিলেন কুমুদবন্ধু সেনের কাছে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইটির খোঁজে। কুমুদবন্ধু সেন বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, 'কেন--যখন আমি কতবার আপনাকে উহা পড়িবার জন্য সাধিয়াছি, প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামীজী বঙ্গ সাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়াছেন—তাহা পড়িয়া দেখুন—বলিয়া বারম্বার অনুরোধ সত্বেও আপনি পড়িতে চাহেন নাই। আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল?'[১১] বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা যে বহু অনুরোধেও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পড়তে চাননি তা হয়ত 'পরিব্রাজকে'র অত্যাধুনিক ভাষারীতির জন্যেই। স্বামী প্রেমঘনানন্দের মতে, 'দেশের অবস্থা বিবেচনা করে হয়তো সেজন্যই স্বামীজী তাঁর পরবর্তী 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পুস্তকের ভাষা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও সংস্কৃত-মূলক করেছিলেন।'[১২] কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র ভাষা কঠিন ও তৎসম শব্দে পূর্ণ নয়, শুধু তার ক্রিয়াপদে কলকাতার মৌখিক উচ্চারণ নেই, আছে আধুনিক চলিত ভাষার লিখিত রূপ, যেমন —ঢুকছে, দাঁড়িয়েছে, আছে ইত্যাদি। মুখের ভাষাও কম নেই—'সে আটঘাট তোমার বন্ধ', 'গালাগালির চোটে অস্থির', 'জাতিধর্মের ঘোড়ার ডিম বুঝেছেন', 'কলের জলের দুশো বাপান্ত করে', 'ভুঁড়ি নাবা বদহজমের প্রথম চিহ্ন', 'রোগে যদি এক আনা মরে ওষুধে মরে পনেরো আনা', 'দু ক্রোশ হেঁটে আসগে যা', 'এ বুদ্ধিটি আগাপাস্তলা ভুল', 'মাপ করো অল্পদর্শীর কথা', 'ইদিকে উদিকে', 'দৌড়চ্ছে', 'বাকিগুলো খালি ভেড়িয়া-ধসান বই তো নয়', 'ভাঁওতায় ভুলো না, 'হিঁদু', 'আমাদের বলবুদ্ধি ভরসা—তিন পেরুলেই ফরসা', 'এ সংসার দেখ্ তোর না দেখ্ মোর', 'ভাল করতে পারব না মন্দ করব কি দিবি তা বল', 'মদ খেয়ে মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচ—এ জাতের কি ভাল রে বাপু', 'নেড়িকুত্তোর খেয়োখেয়ি', 'ত্যালের গায়ে পাতকো', 'মেয়েমানষের পক্ষে', 'পুরুষমানষে দশগণ্ডা বে করলেও ক্ষতি নেই', 'নিজের কোলে ঝোল টানছেন', 'নতুন তো শিখেছ কচুপোড়া খালি বাকি্য চচ্চড়ি' ইত্যাদিকে কোনমতেই 'কঠিন' বা 'সংস্কৃতমূলক' বলা চলে না। বরং মনে হয়, স্বামীজী ক্রিয়া-

পদগুলিকে মাঝে মাঝে কলকাতাই বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন কিন্তু মূল ভাষা-বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করেননি। করতে চানওনি। তিনি বাংলা ভাষা নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন তাতে সাধু-চলিত-সংস্কৃতমূলক বা মৌখিক কলকাতাই সবই ব্যবহার করেছিলেন। 'চাকে খোঁচা না মারিলে মধু পড়ে না', 'পরকে মারিতে গেলে ঢাল খাঁড়া চাই', 'দোষ দেখা বড়ই সহজ, গুণ দেখাই মহাপুরুষের ধর্ম', 'সত্য সকল সময়ে মধুর হয় না', 'নিষ্ঠা ভিন্ন তেজ হয় না' প্রভৃতি প্রবচনধর্মী বাক্য সাধু ভাষায় লেখা হলেও এদের মধ্যে খাঁটি কথ্য ভাষার প্রাণশক্তি লুকিয়ে রয়েছে। স্বামীজী 'বর্তমান ভারতে' এ জাতীয় বহু বাক্য ব্যবহার করেছেন। তাতে মনে হয় সাধু বা চলিত যাই হোক না কেন, স্বামীজী সমগ্র বাংলা ভাষাতেই একটি স্বতন্ত্র শক্তি সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। মনে-মুখে ভাষা এক হলে ভাষা অকৃত্রিম, জোরালো ও সরল হতে বাধ্য। স্বামীজীর পত্রাবলীর কথাও এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। তাঁর লেখা চিঠির সংখ্যা কম নয়, তবে বেশিরভাগই ইংরেজীতে লেখা। বাংলায় লিখেছেন গুরুভাইদের কাছে। অন্যান্যদের কাছে চিঠিও যে নেই তা নয়, তাতে সাবেকী সাধু ভাষা বেশি। অন্তরঙ্গজনেদের কাছে স্বামীজী চিঠি লিখেছিলেন তাঁর প্রিয় কলকেতার ভাষায়। এই চিঠির সংখ্যা পনেরো-যোলোটির বেশি নয়। পূর্বে তিনি চিঠিও লিখতেন সাধু ভাষায়, পরে তিনি মুখের ভাষা, লেখার ভাষা ও চিন্তার ভাষাকে এক করেছিলেন।

এবার দেখা যাক, কলকাতার ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করবার সময় স্বামীজী কি ধরনের শব্দ বেশি ব্যবহার করতে চেয়েছেন। খাস বাংলায় শব্দকে দ্বিগুণ করে বা ঈষৎ বদলে নিয়ে ভাষাকে অর্থবান করে তোলার কৌশলটি পুরনো, অর্থের চেয়ে ধ্বনি সহজে মনে প্রবেশ করে। অনুপ্রাসের গাঁঠ বাঁধার কাজে অনুকার শব্দগুলোর জুড়ি নেই, 'আধুনিক বাংলা ভাষার এটি একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ।'[৯৩] স্বামীজীর রচনায় এর প্রাচুর্য লক্ষ্য করবার মতো। যেমন—কবিতা-ফবিতা, পাত্রী-ফাত্রী, হল্-ফল্, কুটনো-ফুটনো বেদনা-ফেদনা, টাকা-ফাকা, পুজো-ফুজো,

ব্যারাম-ফ্যারাম, মতে-ফতে, মুখ্যু-ফুখ্যু রাজা-ফাজা, মিশনরী-ফিশনরী, ব্যাম-ফ্যাম, মঠ-ফঠ, ঈশ্বর-ফিশ্বর, প্রচার-ফ্রচার, সমাজ-ফমাজ, লেকচার-ফেকচার, সন্ন্যাসী-ফন্যাসী, ঘণ্টা-ফণ্টা, রাঁধুনি-ফাঁধুনি, চক্কর-ফক্কর, শাস্ত্র-ফাস্ত্র, পুলিশ-ফুলিশ, ডাক্তার-ফাক্তার, লিখতে-ফিকতে, ইলোরা-ফিলোরা, বর্মা-ফর্মা, রুশ-ফুস, গুরু-ফুরু, মজুমদার-ফজুমদার, আজগুবি-ফাজগুবি, জায়গা-ফায়গা, ডীড-ফীড, আইন-ফাইন, কায়েত-ফায়েত ও হুঁকো-ফুঁকো। অর্থহীন জোড়া শব্দটি 'ফ' দিয়ে শুরু করার প্রবণতা স্বামীজীর বেশি ছিল। অনুমানে বুঝতে অসুবিধে হয় না কথা বলবার সময়েও তিনি শব্দগুলি এভাবে ব্যবহার করে ভাষায় শক্তি সঞ্চার করতেন। 'কর্ম-ফর্ম ফেলে দে', 'এসব যে মঠ-ফঠ হচ্ছে, এ কি ঠিক হচ্ছে?' 'সেখানে বেশি লেকচার-ফেকচার দিতে পারিনি', 'তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করিস বল্ দেখি? স্মৃতি-ফৃতি লিখে, নিয়ম-নীতিতে বদ্ধ করে এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে manufacturing machine করে তুলেছে' প্রভৃতি উক্তি শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামী-শিষ্য সংবাদে' পাওয়া যায়।

এজাতীয় আরও বহু অনুকার শব্দ রয়েছে, যেমন—প্রসাদটা-আসটা, বুদ্ধি-শুদ্ধি, কাজ-টাজ, ভগবান-টগবান, হেঁজি-পেঁজি, বেড়াচ্চে-চেড়াচ্চে, চেষ্টা-বেষ্টা, ধর্ম-টর্ম, দরজা-টরজা, বুঝি-সুঝি, ফিল্টার-মিল্টার, মালসিসর-আলসিসর, বিদ্যে-সাদ্যি, বাল্মীকি-আল্মীকি, বুড়ি-টুড়ি, বই-টই, ভাষ্য-মাষ্য, উপাধি-টুপাধি, পুঁটি-পাটা, টুপি-টাপার মতো অনুগামী শব্দের সংখ্যাও কম নেই—গালচে-তুলচে, গরীব-গুরবো, পাপী-তাপী, উড়ে-পুড়ে, আতু-পুতু প্রভৃতি। তাঁর নিজের তৈরি করে নেওয়া অনুগামী শব্দও চোখে পড়ার মতো—'বাপন্ত-পিতন্ত'।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীজী প্রয়োজনীয় শব্দ তৈরি করে নিতেন। বিশেষ করে বিশেষণের ক্ষেত্রে তাঁর নতুন শব্দগ্রহণের আগ্রহ চোখে পড়ার মতো! 'বেড়াল চোখো', 'লম্বাই চৌড়াই', 'ছাগুলে বুদ্ধি', কি 'চাঁটগেয়ে মাঝি' হয়তো দুর্লভ নয়। কিন্তু 'বরফান দেশ', 'গঙ্গাসাগুরে ডিঙি', 'কোন্নগুরে মেঘ', 'কলকেত্তাই চাকর', 'চীনি যুদ্ধজাহাজ', 'বাঘা ভাল্কো',

'মেয়েমান্‌ষী চেহারা' নিশ্চয় অভিনবত্ব সঞ্চার করে। 'ছাগুলে বুদ্ধি'র সাদৃশ্যে স্বামীজী তৈরি করেছেন 'মেছো বুদ্ধি', 'ভেতো বুদ্ধি', আলু থেকে 'আলুয়ো বুদ্ধি', কপি থেকে 'কোপো বুদ্ধি'।

ক্রিয়ার ব্যবহারেও বৈচিত্র্য আছে। যেমন, 'ধূমক্ষেত্র মাচাচ্ছে'। 'মাচানো' কথাটা হিন্দীতেই শোনা যায় বেশি। স্বামীজী বহুবার ব্যবহার করেছেন—'হুজুক মাচিয়ে দিক', 'মাচাতে হবে', 'মোচে গিয়েছিল' ইত্যাদি। এমনি আছে 'বকা' শব্দের ব্যবহার—'খালি বকা ঝাড়ছ', 'মাথা বকাস না', 'বকাবকি বলা-কওয়াতে আমাদের মতো কেবা মজবুত', 'আমিও খানিক বকবাদ তায় করেছি'। অন্যান্য বাক্যগঠনও লক্ষ্য করবার মতো—'আমাদের দেশে মড়াকে চেতানো', 'প্যারিসের পর ইউরোপ দেখা চব্যচূষ্য খেয়ে তেঁতুলের চাটনি চাকা', 'বসে ফুঁকতে যত পারো', 'হাত চুবড়ে সপাসপ ডালভাত খাই', 'ওৎ করে ফলের বাগানে পড়ে আছি', 'চুটিয়ে কাজ করে যাও', 'মরে গেলেও হাড়ে ভেলকি খেলবে', 'সবগুলোকে এক সাঁটে ভালবাসা দিবি', 'ফুটে তো বলেন না গুম হোকে রহতি হ্যায়', 'ঢাকা বিক্রমপুরও চাঁইমাছ কচ্ছপাদি জলে ছেড়ে দিয়ে সইভ্য হচ্ছে', 'সাদা বাঙলা কয়ে যা দিকি', 'সকলের ঘাড়ে গতিয়ে দাও', 'ভাত সাপড়ান', 'বোবা হয়ে বসে থাকার না-পারকতায়', 'মেলা কলকব্‌জা মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপাপত্তি করে'। শেষের দুটি বাক্যের দুটি শব্দ 'না-পারকতা' ও 'লোপাপত্তি'-র ব্যবহার দুর্লভ বলা চলে। ই-কারান্ত শব্দের প্রতিও স্বামীজীর প্রবণতা বেশি। তাঁর লেখায় 'গরম' হয়েছে 'গরমি', 'কম' হয়েছে 'কমি'। আমাদের সকল কাজে 'বৈরিগ্যি' বললে 'বৈরাগ্য' নতুন অর্থে 'কুঁড়েমি' বোঝায়।

উত্তর কলকাতায় কিছু কিছু নিজস্ব শব্দ, নিজস্ব উচ্চারণ স্বামীজীর রচনায় মেলে। এদের পাওয়া যায় গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের নাটকেও। প্রায়ই দেখা যায় মনের ভাব প্রকাশে এদের ক্ষমতা অসীম। যেমন ব্যাগত্তা, বোজলা, বেলকোমো, বেডোল, হুড়দঙ্গুলে, আদাড়ে, মধো, চেকড়াই, ফেচাং ইত্যাদি। দু-চারটে উদাহরণ দেওয়া যাক।

'মেলা মুখ্যু ফুখ্যু জড়ো করিসনি বাপু, বোজলাতেই জন্ম গেল দেখছি'

'যাদের মাথায় ঐরকম বেলকোমো ছাড়া আর কিছু আসে না'

'আদাড়ে হয়ে গিয়েছে'

'একটা বেডোল হুজুক মাচিয়ে দিক'

'আমার শ্রদ্ধা আঁচে বুঝে নাও'

'পারতো কর না-পারতো মিছে ফেচাং করো না'

'আমি নিজে অবাক হয়ে যাই সময়ে সময়ে, মধো, তোর পেটে এতও ছিল'

'তাহলে ম্যালেরিয়ার বাপ পলায়ন'

'আমি এখন জিরেন নিতে চললুম'

'গাফিলা হয়ো না'

'তাতে বুড়োই মরে আর চেকড়াই ছেড়ে'

'ছেলেমানুষি হুড়দঙ্গুলের কাজ নয়'

'তাই তো ওৎ করে ফলের বাগানে পড়ে আছি'

'গুঁতোগুঁতির আড্ডা করে দেবার শক্তি আমার নেই'

'যে ঠিকানা ঘড়ি ঘড়ি বদলাবে না'

'বারবার ব্যাগত্তা করি'

'ছোঁড়ারা তাদের কাছে কলকেও পায় না'

'নূতন তো শিখেছ কচুপোড়া খালি বাক্যিচচ্চড়ি'

'সকলের সামনে খিস্তি করে'

'কোনও চিঠি বাজার গুজব করিসনি, চ্যাঙড়ামো নাকি ?'

'বাকি সব দাঁড়া ঝাঁপ, যা মুখে আসে গুরুদেব জুটিয়ে দেন'

'আমাদের দশ বছরের বেটাবিউনিরা'

'আতুড় গায়ে বে করতে চল্‌লেন'

'মোদ্দা সিকন্দর নাছাড় পুরুষ'

'পানের পিক বিচিত্রিত ছ্যালে'

'আঁব কাঠের তক্তায় বসে'

এজাতীয় আরও বহু শব্দের ব্যবহার আছে স্বামীজীর রচনায়।

একই কথা বলা চলে idiom বা phrase ব্যবহারের ক্ষেত্রেও। স্বামীজী এগুলি ব্যবহার করতেন ঠিক প্রবাদের মতো বা উপমার মতো। এদের কোনটি যে তাঁর পূর্বে ব্যবহৃত হত আর কোনটির স্রষ্টা তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কিংবা তিনি স্বয়ং—আজ আর জানবার উপায় নেই।—

'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' দিয়ে আমাকে অনেকে ঠাট্টা করছে

'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'

এত গ্রামে গ্রামে কি 'ভেরেণ্ডা ভাজলে' নাকি

'কথা কানে হাঁটে'

আমার মতে জ্ঞান জিনিসটা এমন কিছু সহজ জিনিস নয় যে 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বে' বলে জাগিয়ে দিলেই হল

'খালি কথায় ধর্ম হয় না' গুরুদেব বলতেন

ইংরেজের 'ওলবাটা মুখ'

'এঁড়ে লাগা' ছেলের বড় অযত্ন

আমার এখন 'পোয়া বারো'

এদের মেয়েদের দেখে আমার 'আক্কেল গুড়ুম'

এমনি 'গোবেড়েন' দিলে

সে 'কুঁয়োর ঘটি তোলার ঠাকুরদাদা'

'সবুজের কাঁড়ি ঢালা' আঁব-নিচু-জাম-কাঁটাল

ওদের (বাঙালীদের) বুদ্ধিশুদ্ধি 'দশ বছরের মেয়ে বে করে করে' খরচ হয়ে গেছে

বেশি 'আতুপুতুতে' শরীর উল্টা

দুটো চল্‌তি কথায় যে ভাবরাশি আসবে তা 'দু-হাজার ছাঁদি' বিশেষণেও নাই

'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে তার মাইনে চোদ্দসিকে'

'পচা কুমড়ো শরীরে'র কথা শুনে যে দেশে হাসতুম

'ক্ষুদে পিঁপড়ের কামড় ডেঁয়োদের চেয়েও অধিক'

'উল্টা বুঝলি রাম'

'বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে'

বাকি সব 'ঘোড়ার ডিম'

তবে আমাদের দেশে 'মড়াকে চেতানো'

'ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না'

'তেলা মাথায় তেল দেওয়া' পাগলের কর্ম

'লোক না পোক'

'সবুরে মেওয়া ফলবেই ফলবে'

'ভুঁড়ি নাবা বদহজমের প্রথম চিহ্ন'

'হাঁকোচ থাঁকোচ' গরুর গাড়ি

দীনা-হীনা ভাবকে 'কুলোর বাতাস' দিয়ে বিদায় কর দিকি

মনে অনেক জিনিস আসে তা ফুটে বল্‌তে গেলেই ক্রমে 'তিল থেকে তাল' হয়ে দাঁড়ায়, 'গিলে ফেললেই ফুরিয়ে যায়'

'দেখ্‌ তোর না-দেখ্‌ মোর'

'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'

'নিজের কোলে ঝোল টানছেন'

বৌদ্ধ বন্ধুরা চটে যাও যাবে, 'ঘরের ভাত বেশি করে খাবে' প্রভৃতি অজস্র প্রবচন স্বামীজীর রচনায় ছড়িয়ে আছে। আজ আর এদের কলকাতার ভাষা বা বাগ্‌বৈশিষ্ট্য বলে আলাদা করা যায় না। কিন্তু স্বামীজীর সমসাময়িককালে বাংলা ভাষায় এই জাতীয় বাগ্‌বৈশিষ্ট্যের প্রাচুর্য বা সাবলীলতা কিছুই ছিল না। সম্ভবত সেজন্যই স্বামীজী 'পরিব্রাজকে'র ভাষা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' একটু বদলে দিয়েছিলেন। পরিবর্তন তার মৌল স্বভাবের নয়, শুধু প্রকাশভঙ্গির। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামীজীর চলিত গদ্যের পরিচয় দেবার সময় তাঁর অসামান্য শব্দ সঞ্চয়ন ও বাগ্‌বৈশিষ্ট্যের অভিনবত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।[২৪] যেমন, খুশির সওদা, নাম নিশানা, বেজায় জেদ, খোঁজখবর। ওলট-পালট, চোরছ্যাঁচোড়, মাপজোপ। হারজিৎ, তাড়াহুড়া, চাষাভুষো, আশেপাশে, ছেঁটেছুঁটে, ছুঁতে না ছুঁতেই, ছোরার চকচকানি, হিঁদুর

হিঁদুয়ানি, প্রাণ থরহরি, বাগে পেলেই, তোপের তালিম, ময়দানি জঙ্গ, ফেটেফুটে চৌচাকলা, কিস্তি বানচাল, হালে পানি পায় না, রকমারি, একদম, রোজই যাহক, ঢঙ, করে নিও, যাহক, বেচারা, গারদ, ধুলোয় কালোয় মেশামেশি, বাঁশের পাটাতন ইত্যাদি। এগুলি বিশেষভাবে কলকাতার ভাষা নয়, কিন্তু চলিত ভাষার অগ্রগতির সঙ্গে এরা ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। বলা বাহুল্য 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র ভাষাই আধুনিক লিখিত বাংলা ভাষার আদর্শ। কলকাতাবাসী ভদ্রসমাজের মুখের ভাষার সঙ্গেও তার কোনো পার্থক্য নেই। একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—

'প্রথমে একটা তামাসা দেখ। ইউরোপীয়দের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে, নির্বৈর হও, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজকর্ম কর, পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আসছি, দুনিয়াটা এই দু-চারদিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর আমাদের ঠাকুর বলছেন, মহা উৎসাহে সর্বদা কার্য কর, শত্রুনাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু 'উল্টা সমঝ্‌লি রাম' হ'ল ; ওরা—ইউরোপীরা যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। সদা মহা রজোগুণ, মহাকার্যশীল, মহা উৎসাহে দেশ দেশান্তরের ভোগ-সুখ আকর্ষণ করে ভোগ করছে। আর আমরা কোণে বসে, পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি, 'নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবন-মতিশয়চপলম্' গাচ্ছি আর যমের ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে। আর পোড়া যমও তাই বাগ পেয়েছে, দুনিয়ার রোগ আমাদের দেশে ঢুকেছে। গীতার উপদেশ শুনলে কে? না—ইউরোপী। আর যীশুখ্রীস্টের ইচ্ছার ন্যায় কাজ করছে কে? না—কৃষ্ণের বংশধরেরা।'[৯৫]

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার দূরত্ব নেই, সাধু ভাষারও না। এ ভাষা একই সঙ্গে মনের ও মননের ভাষা। রবীন্দ্র-নাথ চলিত ভাষার স্বপক্ষে রায় দেন অনেক পরে। কিন্তু 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র ভাষা অনেক আগেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিশ্ব-ভারতীর পাঠ্য-সূচীতেও তিনি বইটি অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দীনেশচন্দ্র

সেনকে বলেছিলেন, 'আপনি এক্ষুণি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময় রূপে প্রকাশিত হতে পারে তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি সূক্ষ্ম ও উদার দৃষ্টি আর পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।'[৯৬]

বস্তুত, স্বামীজীর পরিকল্পিত ভাষার ভিতের ওপরই আধুনিক বাংলা ভাষার ইমারত গড়ে উঠেছে, প্রমথ চৌধুরীর সযত্ন-অনুশীলিত চলিত ভাষার ওপরে নয়। সে ভাষার কৃত্রিমতা সহজেই ধরা পড়ে। তার চাকচিক্য 'প্লাটিনামের আংটির মাঝখানে হীরে'র মতো। মন মুগ্ধ হলেও সে ভাষায় মনের কথা সকলে বলতে পারে না। বলা যায়ও না। ভাবের ভাষাই সবটুকু অভিনিবেশ দাবি করে। আসলে তো ভাষা ভাবের বাহন মাত্র। সেজন্যেই আপামর জনসাধারণের কাছে সে ভাষার আবেদন পৌঁছয়নি। একথা প্রমথ চৌধুরী নিজেও অনুভব করেছিলেন শেষজীবনে। একবার তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়কে বলেছিলেন, 'আমি যে কথ্য ভাষায় লিখেছি সেটা কাদের কথ্য ভাষা? শিক্ষিত স্তরের। কিন্তু তারাই কি সারা দেশ? সাধারণের কথ্য ভাষা আমার লেখনীতে ফোটেনি। আমার এ ভাষাও কৃত্রিম।'[৯৭] কিন্তু স্বামীজীর ভাষায় কৃত্রিমতা ছিল না, ছিল যথার্থতা। যদিও সাহিত্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তিনি তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী নানারকম শব্দ মিশিয়ে বৈঠকী ভাষা ও আটপৌরে ভাষার গ্রন্থিবন্ধন করে-ছিলেন। কোনো শব্দকে 'সাধু' বলে সম্ভ্রমে ব্যবহার করেননি, 'অস্পৃশ্য' বলে দূরে সরিয়ে দেননি। তাঁর মতে, 'বাংলা ভাষা বরং পালির ধাঁচে গঠিত হওয়া উচিত, সংস্কৃতর ধাঁচে নয়। কারণ বাংলার সহিত পালির অধিকতর সাদৃশ্য আছে। বাংলায় পরিভাষা-শব্দ সৃষ্টির জন্য সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে এবং নূতন নূতন শব্দ উদ্ভাবন করিবার চেষ্টাও করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে যদি সংস্কৃত অভিধান হইতে ঐ-সকল শব্দ সংগ্রহ করা হয়, তাহা হইলে বাংলা ভাষা গঠনের প্রভূত সহায়তা হইবে।'[৯৮] তবে বাক্যকে সুভাষিত করবার জন্যে এমন কোনো শব্দ গ্রহণ করেননি যা সুন্দর হলেও সেখানে সুপ্রযুক্ত নয়।

তিনি বলতেন, 'মানুষ যে জিনিসটি তৈরি করে তাতে কোনো একটা idea express করার নামই art। যাতে idea-র expression নেই, রঙ-বেরঙের চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত art বলা যায় না।'[৯৯] ভাষার ক্ষেত্রেও তিনি এই নিয়মটি মেনে চলেছিলেন। ফলে বাংলা ভাষায় তাঁর রচনা রীতি অভূতপূর্ব প্রাণাবেগ সঞ্চার করেছিল। আরো স্পষ্ট করে বলতে হয়, আমাদের কথায়, বাচনভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে শক্তিসঞ্চার করেছিল এই শক্তি। কৃত্রিম সৌজন্য-মিশ্রিত উচ্ছ্বাস নয়, বীরের আন্তরিক অট্টহাস। বাংলা ভাষাকে ব্যক্তিত্ব ও বৈচিত্র্য দান করেছিলেন স্বামীজী। তিনি বাংলা ভাষা নিয়ে যে পরিকল্পনা বা ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন তা বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চা করবার জন্য নয়, ব্যক্তিগত কোনো লাভ বা সম্মানলাভের জন্যও নয়। এমনকি তিনি কলকাতার ছেলে ছিলেন বলে এ ভাষা তাঁর কাছে সহজ ও সহজাত বলেও নয়, করেছিলেন তাঁর গুরুদেবের ভাব ও আদর্শকে ভদ্রেতর সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে। সেজন্যেই তাঁর পরিকল্পিত 'কলকেতার ভাষা' দীর্ঘদিন ধরে লেখার ভাষায় পরিণত হলেও তাতে জড়ত্ব আসেনি, অকৃত্রিম জীবনরসে পুষ্ট হয়ে ক্রমেই পরিপূর্ণতা লাভ করছে।